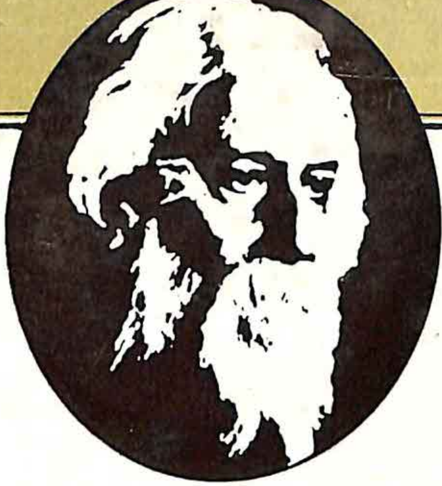


বিশ্বমনাঃ রবীন্দ্রনাথ

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সংকলক

বারিদবরণ ঘোষ

বিশ্বমনাঃ রবীন্দ্রনাথ

আকৈশোর রবীন্দ্র-অনুরাগী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বাংলা ভাষায় যে সব প্রবন্ধাদি লিখেছেন এই বইখানি তার সংকলনবিশেষ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য-গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-ধর্ম-দর্শন এবং সংগীতসহ নানা ভাবনায় আমাদের চিত্তে সমুপস্থিত। কিন্তু তাঁর শাব্দিক পরিচয় ততখানি আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। সুনীতিকুমার একাধিক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষাচর্চার বৈশিষ্ট্যটুকু নিঃশেষে তুলে ধরেছেন। বিশ্বকবির প্রায় অনালোচিত এই দিকটিতে প্রচুর আলোকপাত করে এই কবির্মনীষীকে উপস্থাপিত করেছেন তাঁর পূর্ণ পরিচয়ে।

রবীন্দ্র-সংগীত সম্পর্কে নানা আলোচনার মাধ্যমে পরিচয় থাকলেও ভারতীয় সংগীতের সুবিশাল প্রেক্ষাপটে তাকে বিচার-বিশ্লেষণের সুযোগটি সুনীতিকুমারই প্রথম গ্রহণ করেন। একটি সুবিস্তৃত প্রবন্ধে এই মহান্ সুরকারের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যটি সমগ্রত পরিস্ফুট হয়েছে। সুস্পষ্ট হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বহু বিতর্কিত 'জীবনদেবতা'র বোধটি। বস্তুতপক্ষে বিশ্বের তিল তিল সৌন্দর্যবোধকে সুনীতিকুমার রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতাবাদের মধ্যে সমাহিত দেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ এবং দেশাত্মবোধও একইকালে বিস্ময়কর বিশ্লেষণে তুলে ধরেছেন সুনীতিকুমার তাঁর একাধিক প্রবন্ধে। ফলে পুস্তকটি এক মহান্ ভাষা-বিজ্ঞানীর দার্শনিক-দৃষ্টিতে বিশ্বমনাঃ রবীন্দ্রনাথকে চেনা-জানার অনাস্বাদিত আনন্দের রূপ।

ড. বারিদবরণ ঘোষ

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাবন্ধিক, সমালোচক এবং লেখক বারিদবরণ ঘোষ। বর্তমানে শ্রীগোপাল ব্যানার্জি মহাবিদ্যালয়ে (হুগলী) বাংলা বিভাগের রীডার এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত।

জীবনী, ইতিহাস, পৌরাণিক, ভ্রমণ নানাবিষয়ে ১৪খানি গ্রন্থের রচয়িতা ড. ঘোষ প্রায় ৪০টি নানান ধরনের গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। এই পুস্তকটি তার মধ্যে অন্যতম।

অধ্যাপক ঘোষ সম্প্রতি ভাগলপুর শরৎ শতবার্ষিক সমিতি প্রদত্ত শরৎ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

বিশ্বমনাঃ রবীন্দ্রনাথ

স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সংকলক ঃ

বারিদবরণ ঘোষ

১৩৯৮

প্রথম প্রকাশ :
আশ্বিন ১৩৯৮ ॥ সেপ্টেম্বর ১৯৯১

প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যান্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলকাতা ৭০০ ০৭৩
১৩৫ সাউথ মালাকা : এলাহাবাদ ২১১ ০০১
ঘাসওয়ালা টাওয়ার : পি. জি. সোলাঙ্কি পথ : বোম্বাই ৪০০ ০০৭
৭/১৬ আন্সারী রোড : দরিয়াগঞ্জ : নতুন দিল্লী ১১০ ০০২

প্রচ্ছদ শিল্পী :
অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রক :
কমল মিত্র
নব মুদ্রণ
১বি রাজা লেন : কলকাতা ৭০০ ০০৯

দাম : পঞ্চাশ টাকা

ড. বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রিয়জনেষু

বারিদবরণ ঘোষ

নিবেদন ঃ

রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতিকুমারের ঘনিষ্ঠতা বিষয়ে এই সংকলনের পাঠককে বিস্তারিত জানাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। শুধু সংবাদ হিসাবে জানানো দরকার যে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করার পরই সুনীতিকুমার রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। তারপর থেকেই তিনি তাঁর জীবনের মর্মমূলে শ্রদ্ধার বেদীতে রবীন্দ্রনাথকে আমৃত্যু আসীন রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' বোধ তাঁকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন রেখেছিল।

সুনীতিকুমারের The Origin and Development of The Bengali Language ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথও তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং তাঁর প্রতি অসীম স্নেহবশত তাঁকে নিজের পূর্বদ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণের সঙ্গী করে নেন। এই ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ সুনীতিকুমার তাঁর 'রবীন্দ্রসংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' (১৯৪০) গ্রন্থে সর্বস্তরে লিখে গেছেন। সেকথা স্মরণে রেখেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জাভাযাত্রীর পত্রে' (৩রা শ্রাবণ ১৩৩৪) নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখেছিলেন ঃ 'আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম।...সুনীতির নিরন্ধ্র চিঠিগুলি তোমরা যথা-সময়ে পড়তে পাবে।...সুনীতিকে উপাধি দেওয়া উচিত—'লিপি বাচস্পতি' কিংবা 'লিপি সার্বভৌম' কিংবা 'লিপি চক্রবর্তী'।'

রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমারের মধ্যে দর্শনশক্তি, ধারণশক্তি, আগ্রহ ও সংগ্রহের শক্তি লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তাঁকে নিজের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের মধ্যে অমর করে গেছেন। 'শনিবারের চিঠি'তে রবীন্দ্রবিদ্বেষকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে একটু ভুল বোঝাবুঝি হলেও সুনীতিকুমারের মন থেকে রবীন্দ্রনাথ একটুও সরে যান নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সানন্দে তাঁর 'ভাষা পরিচয়' উৎসর্গ করেছিলেন, আর সুনীতিকুমার কৃতজ্ঞচিত্তে উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর 'বৈদেশিকী' বইটি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সুনীতিকুমারের শ্রদ্ধার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন সম্ভবত তাঁর রবীন্দ্র-বিষয়ক রচনাগুলি। সুনীতিকুমারের 'মনীষী-স্মরণে' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথবিষয়ক রচনাগুলির অধিকাংশ সংকলিত হলেও কয়েকটি প্রবন্ধ পত্র-পত্রিকার জীর্ণ-পৃষ্ঠায়

আবদ্ধ থেকে গেছিল। আমরা সেই সমস্ত রচনা একত্রিত করে এই গ্রন্থখানি প্রকাশের মাধ্যমে আচার্যকে নিবেদন করলাম তাঁর জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য। এই সব রচনায় ভাষাবিৎ সুনীতিকুমারকে যেমন আমরা পাবো রবীন্দ্রনাথের ভাষা-চর্চার পরিচয়বাহী প্রবন্ধগুলিতে তেমনি লক্ষ্য করবো রবীন্দ্রনাথের বিশ্বস্বরূপের প্রকৃতিটিও। একদা সুনীতিকুমারকে বলিদ্বীপের প্রধান ডচ্ রাজপুরুষ শ্রীযুক্ত কারণ বলেছিলেন: 'রবীন্দ্রনাথ কেবল আপনাদের দেশের নহে, উনি সমগ্র মানব-জাতির।' রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বরাজদূতের পরিচয় রয়েছে সুনীতিকুমারের 'ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে। এছাড়া সংগীতকার রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-র মূল যে গ্রীক দেবী আফ্রোদিতে, রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধের বৈশিষ্ট্য—ইত্যাকার পরিচয় সুনীতিকুমার একে একে তুলে ধরেছেন বিভিন্ন প্রবন্ধে। 'বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি আসলে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'দেশে দেশে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের ভূমিকা। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রলিপি' পরিচয়বাহী প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' পত্রিকার পৌষ ১৩৪৭ সংখ্যায়।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের একটি সামগ্রিক পরিচয় সুনীতিকুমারের রচনাগুলি থেকে উঠে এসেছে। সুনীতিকুমার বিষয়ে গবেষণারত আছি—এ কথা জানতে পেরে 'রূপা'র কর্ণধার, আমার শ্রদ্ধার মানুষ, শ্রীযুক্ত দাউদয়াল মেহ্‌রা আমাকে এই গ্রন্থটি প্রস্তুতের ভার অর্পণ করেন। সুনীতিকুমারের পুত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীসুমনকুমার চট্টোপাধ্যায় এ-বিষয়ে আমাকে সহযোগিতা করেন। মুদ্রণ ইত্যাদি বিষয়ে সহযোগিতা করেন প্রিয় শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ। এখন আমার এই শ্রদ্ধার্ঘ্যটিকে পাঠক সমাজ গ্রহণ করলে বাধিত হবো।

রোজভিলা, বর্ধমান। বিনত

১৯৯১ **বারিদবরণ ঘোষ**

সূচী

বিশ্বমনাঃ রবীন্দ্রনাথ

[illegible] [illegible]

ব্যাকরণিয়া রবীন্দ্রনাথ

সব যুগে আর সব জা'তের মধ্যে দেখা যায় যে, নিছক ব্যাকরণিয়াদের সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত লোকের যে ধারণা বিদ্যমান সেটি একটি বিশেষ মিশ্র বস্তু, তাতে শ্রদ্ধা বা প্রীতির চেয়ে অবজ্ঞা, করুণা আর প্রকট বা প্রচ্ছন্ন ভয়ের ভাগ-ই বেশি থাকে ব'লে মনে হয়। অবজ্ঞা এইজন্যে যে, কিছু সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করা তাদের সাধ্যের অতীত; করুণা, কারণ ব্যাকরণিয়া ভাষার ছোবড়া নিয়েই ব্যস্ত, তারা সাহিত্যের রসের উপভোক্তা হবার শক্তি রাখে না,—তাদের কাছে সাহিত্যের মূল্য কেবল এইজন্যেই যে ব্যাকরণ আর অলংকারের উদাহরণ যোগায় ব'লে 'সাহিত্য'কে এই দুই শাস্ত্রের 'সহিত' পড়া চলে; আর ভয় এইজন্যে যে, ব্যাকরণিয়ারা ভাষার নাড়ী-নক্ষত্র আর তার আইন-কানুন সব জানে, তারা অনায়াসেই লেখার দোষ দেখিয়ে দিতে পারে আর তাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুক্তিতে আমরা কুলিয়ে উঠ্‌তে পারি না। ব্যাকরণিয়া যেন সাহিত্যনগরীর পাহারাওয়ালা। এই নগরে চলা-ফেরা ক'র্‌তে হ'লে—কি তার বড়ো সড়কে আর কি তার গলি-ঘুঁজিতে যাতায়াতের নিয়ম মেনে চলা চাই—এই পাহারাওয়ালা সারাক্ষণ পাশে রয়েছেন তালিম দিতে, তা মিষ্টি গলায়ই হোক্‌, আর হুম্‌কি দিয়েই হোক। সাহিত্যের নগরের সহজ নাগরিক যারা নয়, যারা সাহিত্য বিষয়ে জানপদ, যারা অজ্ঞানতার জন্য এই নগরীর বিধি-নিয়ম ভাঙ্‌তে খুব-ই পটু, সেই রকম 'গাঁওয়ার' লেখক বা সাহিত্যিকম্মন্যেরা এই পাহারাওয়ালাদের জন্য বড়োই অস্বস্তি বোধ করে। আর অন্য সাধারণ লোক যারা সাহিত্যের হাটে খালি মজা দেখ্‌তে চায়, তারাও অনেক সময়ে এই পাহারাওয়ালাদের টিক্‌টিক্‌ করাটা পছন্দ করে না। অনেক জায়গায় আবার ব্যাকরণিয়া অনাবশ্যক বড়ো বেশি চিৎকার করে। তার আইন-কানুন যে মাঝে-মাঝে

বদলানোর দরকার সে খেয়াল তার থাকে না, আর কত দূর পর্য্যন্ত তার এলাকা সেটাও সে নিজে ভালো রকম জানে না।

আগেকার যুগের ব্যাকরণিয়ারা যে বিদ্যাটুকু নিয়ে আসর জমিয়ে এসেছে, দেখা যাচ্ছে যে আধুনিক কালে জীবন্ত ভাষার ব্যাকরণিয়াদের আর খালি সে বিদ্যাটুকুতে আঁট্‌ছে না। দুপাত সংস্কৃত ব্যাকরণ প'ড়ে—তাও আবার অত্যন্ত আবছা-আবছা-ভাবে—বাঙলা ভাষার দরবারে মোড়লি করা আর সম্ভব হ'চ্ছে না। যেমন খালি লাটিনের আর গ্রীকের ওস্তাদ হ'য়ে ইংরিজি ভাষায় আজকাল আর অপ্রতিহতভাবে রাজ্য শাসন করা চলে না। বৈয়াকরণকে এখন ভাষাতাত্ত্বিক হ'তে হ'চ্ছে; খালি পুরাতন ভাষার বা আর্য্য ব্যাকরণের নজির দেখিয়ে তার বাড়ি নিয়ে আস্ফালন কেউ মানতে চায় না। আধুনিক ভাষায় ব্যাকরণ নিয়ে যাঁরা কিছু ব'ল্‌তে চান, তাঁদের গুরুমশাইগিরি ছেড়ে এখন আধুনিক জীবন্ত ভাষার রীতি-নীতি নিয়ে অনুশীলন ক'র্‌তে হবে,—এর গতি এর নিয়ম সব বা'র ক'র্‌তে হবে। তাঁদের এখন নিজের ভাষার সব তল্লাটের খবর রাখ্‌তে হবে, কেবল ভাষা-সরস্বতীর উদ্দণ্ড চৌকিদার হ'য়ে সাহিত্যিক আর পাঠকের মনে ব্যাকরণ-বিভীষিকা জাগিয়ে তুললে চ'ল্‌বে না। সমগ্র সাহিত্য নগরীর বা ভাষা-বিষয়ের পুঙখানুপুঙখ খবর নিজে জেনে সাধারণ অব্যবসায়ীদের মুখ্য কথাগুলি সহজবোধ্য সুখবোধ্য ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা নিজের ভাষা আর তার গতি আর সঙ্গে-সঙ্গে তার সাহিত্যের বিশিষ্টতা আর বৈচিত্র্য হৃদয়ংগম ক'র্‌তে পারে, আর এই নবীন রীতির ব্যাকরণিয়াদের দ্বারা তাদের চোখের সামনে ধ'রে-দেওয়া ভাষার নিয়ম বা সূত্রগুলির সার্থকতা উপলব্ধি ক'রে চ'ল্‌তে পারে।

বাঙলা ভাষা এখনও সাবেক কালের এই সব চৌকিদার ব্যাকরণিয়াদের হাত থেকে পুরোপুরি নিষ্কৃতি পায় নি। এঁরা এখনও 'পৃষ্ঠ' না লিখে 'পৃষ্ঠা' লিখ্‌লে আপত্তি করেন—'পরিষৎ-

মন্দির', 'পাশ্চাত্য', 'সৃজন', 'সহায়ক', 'অন্তর্যামী', 'নিস্তেজ', 'রজকিনী', 'বিবরণী', 'স্বর্গীয়', প্রভৃতি বাঙলার পদ দেখ্‌তে পেলে এঁরা এখনও বাঙ্‌লা ভাষার দুরবস্থার কথা ভেবে আকুল হন, আর কেউ কেউ বা আবেগের ভরে কবিতাও লিখে ফেলেন। এই সব ব্যাকরণিয়াদের হাতে বাঙালী শিক্ষিত লোকে ইস্কুল-পাঠ্য ব্যাকরণ আর ছেলেদের শাসনের ভারটা অর্পণ ক'রে দিয়ে, ভাষা বিষয়ে সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছে, আর নিশ্চিন্ত মনে এতদিন ধ'রে যেমন শব্দ বা ভাষা সাধারণ জীবনে সে ব্যবহার ক'র্‌তে অভ্যস্ত সেই রকম ভাষা বা শব্দ সাহিত্যেও ব্যবহার ক'রে আস্‌ছে—সংস্কৃত অভিধানের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার তার ফুরসৎও নেই, ইচ্ছাও নেই। চৌকিদার ব্যাকরণিয়া মাঝে মাঝে 'বে-আইনী হ'লো!' ব'লে চেঁচালেও সে কথা কেউ মান্‌ছে না—ইস্কুল কলেজের 'পা শা থী' প'ড়োদের কেউ কেউ ছাড়া।

বাঙলা ভাষার রাজ্যে এখন বহু বিষয়ে অরাজকতা চ'ল্‌ছে। এখানে শৃঙ্খলা আনা চাই। কিন্তু এ বড়ো কঠিন কাজ। প্রথমেই তো দেখা যায়, বাঙলার বানান-সম্বন্ধে কোনও নিয়ম নেই। 'তৎসম' বা সংস্কৃত শব্দ যেগুলি ভাষায় আমদানি করা হয়েছে আর যেগুলি নিজেদের মূল সংস্কৃত রূপ অনেকটা অক্ষুণ্ণ রেখেছে (তা উচ্চারণেই হোক্ আর কেবল বানানেই হোক্), সেগুলি নিয়ে কোনও গোল নেই। সেগুলি বাঙলা ভাষায় সংস্কৃত বানান-ই বজায় রাখ্‌বে। অর্ধ-তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে ধার ক'রে নেওয়া আর তারপর বাঙালীর মুখে বিকৃত হ'য়ে-যাওয়া শব্দ নিয়েও তেমন ঝঞ্ঝাট নেই; এগুলিকে আমরা প্রায় উচ্চারণ অনুসারে বানান করি, যেমন 'কেষ্ট, নেমন্তন্ন, চন্নামের্ত, চক্কত্তী, ভট্‌চাজ, শীগ্‌গির, মোচ্ছব', ইত্যাদি। কিন্তু যত গোল 'তদ্ভব' অর্থাৎ প্রাকৃতের মধ্যে দিয়ে পাওয়া অর্থাৎ কিনা খাঁটি বাঙলার শব্দ আর রূপে। বিদেশী শব্দের সম্বন্ধেও আমাদের কোনও শৃঙ্খলা নেই। যাঁরা 'কাজ' শব্দকে অন্তস্থ 'য' দিয়ে বা 'সোনা' শব্দকে

মূর্ধন্য 'ণ' না দিয়ে লিখ্‌লে ভাষার বিরুদ্ধে অপরাধ করা হ'লো মনে করেন, তাঁরা অম্লান বদনে—আর অকম্পিত করে—দন্ত্য 'স' দিয়ে 'সাধ সরম সহর' লেখেন, তালব্য 'শ' দিয়ে 'শোওয়া' লেখেন, আর মূর্ধন্য 'ষ' দিয়ে 'জিনিষ' লেখেন। সংস্কৃত ব্যাকরণিয়াদের হাতে প'ড়ে বাঙলার প্রাকৃতজ তদ্ভব শব্দগুলি তাদের বানানের ইতিহাসকে ভুলে গিয়েছে। এ-সব বিষয়ের সমাধান ক'র্‌তে গেলে, ব্যাকরণের খুঁটিনাটি আলোচনা ক'রে যাঁরা আনন্দ পান এমন বাঙালীর বাঙলা ভাষার ইতিহাস আর তার আধুনিক কালের হালচালের সম্বন্ধে ঠিক খবর জান্‌বার জন্য চেষ্টা করা উচিত। ভাষার ঠিক স্বরূপটি নির্ণয় হ'লে তবে তার সম্বন্ধে নিয়মাবলী ক'র্‌তে পারা যাবে।

বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ অনেক লেখা হ'য়েছে, কিন্তু তার সব-গুলি-ই হ'চ্ছে সংস্কৃতের আওতায় বেড়ে-ওঠা আধুনিক সাহিত্যের 'সাধুভাষা'র ব্যাকরণ। বাঙলার ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় যেটুকু কাজ হ'য়েছে তাও নগণ্য। বিদেশীরা যা কিছু একটু এ-বিষয়ে অন্য ভাষার সঙ্গে তুলনা কর্‌বার কালে ক'রেছেন। বাঙলা-ভাষীদের মধ্যে প্রথম মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বাঙলা ভাষায় বাঙলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন ('গৌড়ীয় ব্যাকরণ', প্রকাশ-কাল খ্রীষ্টাব্দ ১৮৩৩)। এই বইয়ে রামমোহন তাঁর অনন্যসাধারণ সহজ সুবুদ্ধির পরিচয় দেন। বাঙলা ভাষার শব্দ-সাধন ব'ল্‌লে বাঙালী ব্যাকরণিয়া বুঝ্‌তেন ভাষাগত সংস্কৃত শব্দের সাধন,—খাঁটি বাঙলা তদ্ভব শব্দ নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাতে চাইতেন না—বাঙলার ঠিক রূপটি কী সে বিষয়ে সাধারণতঃ কোনও ধারণা তাঁদের না থাকায়। ১৮৮১ সালে চিন্তামণি গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁর বাঙলা ব্যাকরণে এই বিষয়ে আলোচনা করেন, আর খাঁটি বাঙলার শব্দ আর প্রত্যয় নিয়ে 'ঐতিহাসিক আলোচনা' করেন, তাদের উৎপত্তি আর বিকাশের সূত্র বা'র কর্‌বার চেষ্টা করেন।

কিন্তু আধুনিক কালের কথিত বাঙ্‌লা ভাষার আলোচনায়

কতকগুলি মৌলিক প্রসঙ্গ বাঙালীর কাছে প্রথম উত্থাপন করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মন্তব্যগুলি ১২৯৮ সাল থেকে বা'র হ'তে থাকে, সেগুলিকে 'শব্দতত্ত্ব' নাম দিয়ে আলাদা বইয়ের আকারে প্রকাশ করা হ'য়েছে; পরে দু-একটি লেখা—যেমন বাঙলা তির্য্যক্ রূপের উপর—'প্রবাসী' পত্রিকায় আর অন্যত্র বেরিয়েছে। কোন্ পথ ধ'রে বাঙলা ভাষার চর্চা ক'র্‌তে হবে তা এমন ক'রে তাঁর আগে কেউ দেখাতে পারেন নি। আধুনিক মতে ব্যাকরণের তিন অঙ্গ—১. উচ্চারণ-বানান-ছন্দ, ২. সুপ্-তিঙ্-কৃৎ-তদ্ধিত শব্দসাধন, আর ৩. বাক্যরীতি। এর মধ্যে উচ্চারণটা-ই এক হিসাবে সব-চেয়ে বেশি দরকারী জিনিস—উচ্চারণের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষায় বিভক্তি আর প্রত্যয়ও বদ্‌লায়, ভাষার পরিবর্তন ঘটে। বাঙলার উচ্চারণ সম্বন্ধে কতকগুলি অতি সাধারণ কথা—এত সাধারণ কথা যে সেগুলি আমরা আগে লক্ষ্যই করি নি—রবীন্দ্রনাথ প্রথম আমাদের চোখের সামনে ধ'রে দেন। বাঙলার ধ্বনি-সমষ্টির ইতিহাসের সব-চেয়ে বিশিষ্ট কতকগুলি সূত্র বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ-ই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন (তাঁর 'বাংলা উচ্চারণ', 'টা টো টে', 'স্বরবর্ণ অ', 'স্বরবর্ণ এ',—১২৯২ আর ১২৯৯ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধ-চতুষ্টয়ে)। কি কোল, কি দ্রাবিড়, কি আর্য্য,—আধুনিক কালের সমস্ত ভারতীয় ভাষার একটি প্রধান বিশেষত্ব হ'চ্ছে তাদের ধ্বন্যাত্মক শব্দ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ১৩০৭ সালে প্রকাশিত 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' প্রবন্ধে বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত এইরূপ শব্দের একটি পূর্ণ সংগ্রহ দিয়েছেন,—আর এইরূপ শব্দ ব্যবহারের অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্বটুকু তাঁর কবি-মনের কাছে যেরূপ প্রকাশ পেয়েছে তা তিনি ব্যক্ত ক'রেছেন। ভারতের আর কোনও ভাষায় এই রকম শব্দের এর চেয়ে ভালো আলোচনা আছে কিনা জানি না। পরে ১৩১৪ সালে স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় 'ধ্বনি-বিচার' নামে এক উপাদেয় আর বহু-বিচার-পূর্ণ প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আরও খুঁটিয়ে আলোচনা

করেন। তেমনি রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা শব্দদ্বৈত' (১৩০৭ সাল), 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' (১৩০৮), 'সম্বন্ধে কার' (১৩০৫) আর 'বাংলা বহুবচন' (১৩০৫) প্রবন্ধে ঐ ঐ বিষয়ে বিশেষ-ভাবে প্রণিধানযোগ্য আলোচনা আছে। বীম্‌সের বাঙলা ব্যাকরণ সমালোচনা উপলক্ষ্যে (১৩০৫ সালে লেখা) বাঙলার উচ্চারণ সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি মূল্যবান্ মন্তব্য লিপিবদ্ধ ক'রেছেন; আর তাঁর 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধে বাঙলার কতকগুলি সাধারণ-কর্তৃক অলক্ষিত বিশেষত্ব পরিষ্কার ক'রে দেখানো হ'য়েছে।

বাঙলা ভাষার চর্চায়, বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক, আধুনিক জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও চিন্তা-নেতা যে পথ দেখিয়েছেন—যে কথিত ভাষায় পূর্ণ আলোচনা বিনা কোনও ভাষায় ব্যাকরণ বা ইতিহাস লেখা হ'তে পারে না—সেইটেই বাঙলার ব্যাকরণ আর ইতিহাস আলোচকের পক্ষে একমাত্র পথ। ভাষাতত্ত্বের আলোচনা কেবল উপলব্ধি দ্বারা হয় না, একে প্রতি পদে বাঙ্ময় বস্তুকে, উচ্চারিত শব্দকে আশ্রয় ক'রে চ'ল্‌তে হয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের গভীর অধ্যয়নের আর চিন্তার বহু প্রমাণ তাঁর লেখা থেকে পাওয়া যায়। এই বিদ্যার আলোচনায় যে পরিশ্রম আবশ্যক তা তিনি স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। তবেই তো তিনি তাঁর সহজ-বুদ্ধি-প্রসূত ভাষার স্বরূপবোধকে বিজ্ঞানের আলো দিয়ে উদ্ভাসিত ক'রে দেখাতে পেরেছেন। তিনি স্পষ্ট ক'রে বাঙালীকে ব'লেছেন যে, 'প্রাকৃত বাংলাভাষার নিজের একটি স্বতন্ত্র আকারপ্রকার আছে, এবং এই আকৃতিপ্রকৃতির তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া শ্রদ্ধার সহিত অধ্যবসায়ের সহিত বাংলাভাষার ব্যাকরণ রচনায়' যোগ্য লোকের উৎসাহ হওয়া উচিত। সুতরাং ভবিষ্যৎ বাঙালী ব্যাকরণিয়া, যাঁরা গুরুমশাইগিরি ত্যাগ ক'রে 'শ্রদ্ধার সহিত অধ্যবসায়ের সহিত' এ পথে চ'ল্‌বেন, তাঁদের সকলকেই রবীন্দ্রনাথকে একজন 'পথিকৃৎ' আর 'পূর্ব্যঃ ঋষিঃ' ব'লে মেনে নিতে হবে। আর আমাদের মধ্যে যারা ভাষাতত্ত্বকে উপজীব্য বিদ্যা ক'রে নিয়েছি,

যারা এর অন্ধি-সন্ধি গলি-ঘুঁজিতে ঘোরা-ঘুরি ক'র্‌ছি আর তার মধ্যেকার ধস্‌না আর ঢিবি খুঁড়ে দেখ্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছি, আমাদের এই সুপ্রাচীন ভাষানগরী এই সুবিরাট্ সাহিত্যপুরী আগে কী অবস্থায় ছিল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এই নগরীর কাব্য-দর্শন-ইতিহাস-রূপকর্ম প্রভৃতির নোতুন নোতুন সব বড়ো সড়কের সঙ্গে পরিচয় রাখ্‌বারও চেষ্টা ক'র্‌ছি। জীবনের আর সাহিত্যের রসের দিক্‌টাকে বর্জন ক'রে একেবারে নিছক ব্যাকরণিয়া ব'নে যাবার প্রবৃত্তি আমাদের যাদের নেই—আমরা যদি এ বিষয়ে একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করি যে, যিনি বিশ্বসাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ রসস্রষ্টা তিনি-ই এ-বিষয়ে আমাদের অগ্রণী, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণিয়া, তাহ'লে আশা করি আমাদের সেই আত্মপ্রসাদটুকু সকলেই ক্ষমা ক'র্‌বেন।

শান্তিনিকেতন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

বাক্‌পতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ

উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্,
উত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোতি এনাম্।
উতো তুঅস্মৈ তন্বং বি সস্রে—
জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ ॥

কেহ বাক্‌কে দেখিয়াও দেখে না,
কেহ ইহাকে শুনিয়াও শুনে না।
কিন্তু [বাক্] কাহারও-জন্য [নিজ] তনু আবিষ্কৃত করে,
পতির-জন্য প্রেমময়ী সুন্দর-বস্ত্র-পরিহিতা জায়া যেমন ॥

প্রায় ৫০ বৎসর হইল রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মাতৃভাষা সম্পর্কে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন—তাঁহার "বাংলা উচ্চারণ" শীর্ষক প্রবন্ধ। এটি তাঁহার "শব্দ-তত্ত্ব"-নামক প্রবন্ধ-সংগ্রহে প্রথম দেওয়া হইয়াছে। ইহার পূর্বে ও পরে তাঁহার সাহিত্য-জীবনে তিনি নানা-ভাবে সাহিত্য-সৃষ্টি এবং সাহিত্য-আলোচনা এই উভয় পথেই অদ্ভুত শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে ধন্য এবং ইহাকে জগৎ-সমক্ষে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার মুখ্য প্রকাশ ঘটিয়াছে বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে। একদিকে তিনি যেমন অপার্থিব বিভূতির অধিকারী, যে বিভূতি বা দেবদত্ত শক্তি না থাকিলে শিল্প-রচনা সার্থক এবং শাশ্বত রস রচনার পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে না, তেমনি অন্য দিকে তিনি সাধক, তিনি প্রয়োগ-বিজ্ঞানে নিপুণ শিল্পী, যে প্রয়োগ-বিজ্ঞান এবং শিল্প-নৈপুণ্য তাঁহার রস-সৃষ্টিকে আদিম বা আদিম-গন্ধী এবং অশিক্ষিত-পটু রচনার ঊর্ধ্বে, প্রৌঢ় এবং শিক্ষিত শিল্পের পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্তে একাধারে অপার্থিব রসানুভূতি ও বস্তু-তন্ত্র বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়; সেই জন্যই তাঁহার রচনা ও আলোচনা উভয়ই কল্পনা ও বিজ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল।

প্রয়োগ-নিপুণ শিল্পী বলিয়া-ই রবীন্দ্রনাথ কেবল অনুভূতি ও আবেগ আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারেন নাই, তাঁহাকে বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দিতে হইয়াছে, তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক হইতে হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির কাছে কিছুই তুচ্ছ নয়—যাহা-কিছু চর্মচক্ষের সমক্ষে "সৎ" বা বিদ্যমান, তাহার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তির কৌতূহল থাকিবেই। রবীন্দ্রনাথের মনও এই বিশ্বন্ধর বৈজ্ঞানিক মন। বৈজ্ঞানিক বিশ্বন্ধরত্ব এবং সঙ্গে-সঙ্গে রসানুভূতি-জাত কল্পনা ও প্রকাশশক্তির একত্র সমাবেশ, পৃথিবীতে খুব কম-ই দেখা গিয়াছে। আধুনিক ইউরোপের সাহিত্য-ক্ষেত্রে এইরূপ মনের প্রকৃষ্ট পরিচয় আমরা পাই জর্‌মান কবি Goethe গ্যোতে-তে; আমাদের দেশে রস-রচয়িতাদের মধ্যে এরূপ সর্বন্ধর বৈজ্ঞানিক-মন বোধ হয় এক রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই পাওয়া গিয়েছে।

বিশ্ব-প্রপঞ্চের ব্যাপার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ঔৎসুক্য এবং অনুধাবনের পরিচয় দিয়াছেন। গণিত, ফলিত বিজ্ঞান—দ্যুলোকতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞান রীতিমত অনুশীলন না করিলেও ঐসব বিষয় সম্বন্ধে আধুনিক সভ্য ও সংস্কৃতিপূত চিত্তের উপযোগী কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসা তাঁহার আছে। তাঁহার মধ্যে রসসৃষ্টির অপরিহার্য্যতা বা অবশ্যম্ভাবিতা না থাকিলে, এই মন লইয়া রবীন্দ্রনাথ হয়তো একজন বড়ো দরের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক হইতে পারিতেন। তিনি ভাষা-গত বস্তুর আলোচনা অবলম্বন করিয়া যে সহজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আধুনিক ভারতে ভাষানুসন্ধিৎসুগণের পক্ষে ইহা একটি মার্জনীয় আত্মপ্রসাদের কথা যে, রবীন্দ্রনাথের মতো দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন কবি শাব্দিকগণের অগ্রণী হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রকাশ হইতেছে প্রধানতঃ বাঙ্ময় প্রকাশ। সংগীত, অভিনয়, রূপকর্ম—এই তিনেও তাঁহার লক্ষণীয়

এবং প্রশংসনীয় কৃতিত্ব থাকিলেও, মুখ্যতঃ তিনি কবি, তিনি শব্দ-চিত্রকার, তিনি ভাষাশিল্পী। তাঁহার প্রতিভার এই প্রধান অবলম্বন, ভাষা, এবং বিশেষ করিয়া বঙ্গভাষা, তাঁহাকে যে আকৃষ্ট করিবে, তাহা স্বাভাবিক।

মধ্য-যুগের সংস্কৃত বৈয়াকরণ বোপদেব তাঁহার "মুগ্ধবোধ" ব্যাকরণের প্রারম্ভে, ভাষা এবং ভাষাশ্রয়ী চিন্তার উৎস-স্বরূপ শাশ্বত সত্তাকে প্রণাম করিয়াছেন চিরাচরিত রীতিতে "ওঁ নমঃ শিবায়" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ; কারণ উপনিষদের কথায়, "প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী"—এই শাশ্বত শিব হইতে পুরাতনী প্রজ্ঞা—বাক্ নিঃসৃত হইয়াছেন। তাহার পরে বৈয়াকরণ সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর ভাবের পরিচায়ক দুইটি শব্দে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন ঃ শং শব্দৈঃ ॥

অর্থাৎ, শব্দ-সমূহ দ্বারা শম্ অর্থাৎ মঙ্গল হউক। বৈয়াকরণ এখানে রহস্যবাদী হইয়াছেন—ক্ষুদ্র দুইটি শব্দের সাহায্যে, মানব-ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি, সৌন্দর্য এবং অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে তাঁহার চেতনা বা উপলব্ধির আভাস তিনি দিয়াছেন ; বাঙ্ময়-গত রহস্য বা আনন্দ-বোধের পরিচয় নীরস ব্যাকরণ-সূত্রে পরে আর কোথাও দিবার সুযোগ তাঁহার নাই। রবীন্দ্রনাথও নিজের সমগ্র জীবনে শব্দ-দ্বারা এই 'শম্' বা 'সত্য-শিব-সুন্দর'-এর প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যে শব্দের শক্তি, প্রয়োগ ও বিবৃতি—অর্থাৎ 'ব্যাকরণ'—লইয়া বিচার করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই ; বৈজ্ঞানিক-সুলভ কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার বশে কবি রবীন্দ্রনাথ 'ব্যাকরণিয়া' রবীন্দ্রনাথ হইতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি ও রীতি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার "বাংলাভাষা-পরিচয়" বইয়ে। বছর তিনেক হইল এই বই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে নিজ অবলোকনলব্ধ কতকগুলি মূল্যবান তথ্য রবীন্দ্রনাথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা রবীন্দ্রনাথের এ-তাবৎ প্রকাশিত শেষ রচনা। রবীন্দ্রনাথ ভাষা-বিজ্ঞান-ব্যবসায়ীর মতো অনুশীলনরীতি বা পরিপাটী অবলম্বন করিয়া ভাষাতত্ত্বের চর্চা করেন নাই, সেইজন্য তিনি নিজেকে "ভাষা-সম্বন্ধে ভূগোল-বিজ্ঞানী" না বলিয়া, নিজের সম্বন্ধে বলিতেছেন—"আমি যেন পায়ে-চলা পথের ভ্রমণকারী।...বিজ্ঞানের রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দাদের মতো সঞ্চয় জমা হয় নি ভাণ্ডারে, রাস্তায় বাউলদের মতো খুশি হ'য়ে ফিরেছি, খবরের ঝুলিটাতে দিন-ভিক্ষে যা জুটেছে তার সঙ্গে দিয়েছি আমার খুশির ভাষা মিলিয়ে।...জ্ঞানের দেশে ভ্রমণের শখ ছিল ব'লেই বেঁচে গেছি, বিশেষ সাধনা না থাক্‌লেও। সেই শখটা তোমাদের মনে যদি জাগাতে পারি, তা হ'লে আমার যতটুকু শক্তি সেই অনুসারে ফল পাওয়া গেল মনে ক'রে আশ্বস্ত হবো।"

রবীন্দ্রনাথ নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ বিচার-শীল হইয়া কথাগুলি লিখিয়াছেন। তাঁহার ভাষাতত্ত্ব-আলোচনার প্রেরণা নিজের কথাতেই তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন—"মানুষের মনোভাব ভাষাজগতের যে অদ্ভুত রহস্য আমার মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে, তারই ব্যাখ্যা ক'রে আমি এই বইটি আরম্ভ ক'রেছি।" আমার মনে হয় ভাষা সম্বন্ধে এই রহস্যবোধ, আর ভাষার ব্যাখ্যার চেষ্টা, এই দুইটির সম্বন্ধে একটা সচেতন ভাব এবং কৌতূহল, তাঁহার রস-রচনা এবং ভাষা-ঘটিত আলোচনা, উভয়ের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনে জাগাইতে সমর্থ হইয়াছেন।

ভাষা-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের "বিশেষ সাধনা" ছিল না একথা তিনি বলিয়াছেন। বিশেষ সাধনা, professional বা পেশাদার ভাষাতাত্ত্বিকের মতো ছিল না, হয়তো একথা সত্য ; কিন্তু এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সাধনা যে অনন্যসাধারণ, তাহার পরিচয় তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালা ছন্দবিষয়ে আলোচনায় ভূরি ভূরি আছে। "শব্দতত্ত্ব"র প্রবন্ধাবলী হইতে দেখা যায়, চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের যতটুকু অনুশীলন হইয়াছিল,

রবীন্দ্রনাথ তখন সে সমস্তটুকুর সহিত পরিচিত ছিলেন। উপরন্তু তিনি আধুনিক বাঙ্গালার উচ্চারণ সম্বন্ধে, এবং বাঙ্গালার ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত প্রভৃতি কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রথম অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, প্রথম চিরতরে এইসব বিষয়ে কতকগুলি সূত্র আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। যেমন বাঙ্গালার স্বর-সংগতির সূত্রগুলি ; বাঙ্গালার ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রকৃতি—ইহার-ই আধারে স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার এই শ্রেণীর শব্দগুলির এক অতি চমৎকার আলোচনা করেন ("ধ্বনিবিচার", সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৪ সাল, দ্বিতীয় সংখ্যা ; "শব্দ-কথা", ১৩২৪, গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ)। বাঙ্গালা নাম ও সর্বনাম শব্দের তির্য্যক্ রূপ সম্বন্ধে, এইরূপ আরও কতকগুলি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা বাদ দিতে পারা যায় না।

প্রথম প্রথম রবীন্দ্রনাথ ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় যেভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, পরবর্তীকালে সে আকর্ষণ তাঁহার মনে হয়তো ছিল না—কারণ পেশাদার ভাষাতাত্ত্বিক না হইলে এই জটিল বিষয়ের সমস্ত সূত্র ধরিয়া অনুসন্ধান করা সাধারণের পক্ষে একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়ে—ভাষাশিল্পী কবির পক্ষেও বটে। নিছক শাব্দিক অপেক্ষা কবির আসন অনেক উচ্চে,—শাব্দিকের মতো আদার ব্যাপারী হইয়া থাকা কবির পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কবি যে অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই ধারা বহিয়া উত্তর-কালে শব্দশাস্ত্রের কোনও বিরাট গবেষণায় তাহার পরিণতি হয় নাই। ইহাতে হয়তো শব্দশাস্ত্রের দিক হইতে আমরা একটু আক্ষেপ করিতে পারি ; কিন্তু সমস্ত শব্দশাস্ত্র অপেক্ষা যাহা বড়ো, যাহা ব্যাপক, যাহা মানবজাতির পক্ষে উপযোগী, সেই কাব্য-সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ সমৃদ্ধ করিয়াছেন, মানবজাতির শাশ্বত সম্পদ রূপে তাহাকে বাঙ্গালা ভাষায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ; নিছক বৈজ্ঞানিক হইয়া শব্দের জালে তিনি যে জড়াইয়া পড়েন নাই, শব্দকে পক্ষ করিয়া তিনি অসীমে

যে উড্ডীন হইয়াছেন, ইহা মানবজাতির সৌভাগ্য।

ছন্দের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ছন্দের প্রকৃতি লইয়া কতকগুলি বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় যে ভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাঙ্গালা ছন্দের আলোচনা করিয়াছেন—বিশেষতঃ অমূল্যবাবু যে ভাবে বাঙ্গালা ছন্দের রীতি ও নিয়মগুলি সূত্র-নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথ সেভাবে ছন্দতত্ত্ব লিখেন নাই। এখানে তিনি ছন্দোরাজ্যের বিজ্ঞান-সম্মত ভৌগোলিক নহেন, তিনি ছন্দোরাজ্যের সম্রাট্,—এমন জনপ্রিয় সম্রাট্ যিনি নিজ রাজ্যে সর্বত্র স্বাধীন-ভাবে অপ্রতিহত গতিতে বিচরণ করেন, ও সেই দেশের খবর যাহারা চাহে তাহাদেরও এই বিচরণ-লব্ধ জ্ঞান দিতে কার্পণ্য করেন না।

রবীন্দ্রনাথের ভাষার উপর অধিকার এবং ভাষার প্রকৃতি-সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি বিবেচনা করিলে, সত্যই তাঁহাকে "বাক্‌পতি" বলিয়া সংবর্ধনা করিতে হয়। আমাদের বাঙ্গালা ভাষা ধন্য, ইহার কাব্য-সাহিত্য ধন্য, ইহার তথ্যানুশীলন ধন্য, যে এই ভাষায় এত বড়ো বাক্‌পতি কবি এবং মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—যিনি সত্যকার বাগ্‌দ্রষ্টা ও বাক্‌শ্রোতা, এবং যাঁহার নিকট বাগ্‌দেবী আপনাকে প্রকট করিয়াছেন।

কবিতা, রবীন্দ্র-সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৮

রবীন্দ্রনাথ

ও

বাঙলাভাষা

১৯১৩ সালে ক'লকাতায় এম্-এ পাস করি। বিষয় ছিল ইংরিজি। এম্-এ পরীক্ষার জন্য ইংরিজি পড়ার যে ব্যবস্থা ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, তা'তে বিষয়টি দু'টি পৃথক ভাগে ভাগ করা হ'য়েছে—এক, শুদ্ধ আধুনিক ইংরিজি সাহিত্য, আর দুই, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইংরিজি সাহিত্য আর ইংরিজি ভাষাতত্ত্ব। কলেজে প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে সাহিত্যের চাইতে ভাষাতত্ত্বের প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করি। একটু গুণ্ডাপ্রকৃতির ছিলুম—ব্যায়াম করা, দৌড়ধাব, ধাক্কাধুক্কি, এইসবে প্রবৃত্তি ছিল। আমাদের সঙ্গে কতকগুলি সহপাঠী ছিলেন, তাঁরা অতি মোলায়েম প্রকৃতির, ব'সে ব'সে কবিতা লিখ্‌তেন আর কবিতা প'ড়্‌তেন, আর তাঁদের কারও-কারও চাল-চলনে কথাবার্তার ধরনে যেন একটি অত্যন্ত সুকুমার ভাব তাঁরা প্রকট ক'রতেন। এটা আমার ভালো লাগ্‌ত না—যখন এইসব সহপাঠী চোখে একটু উদ্‌ভ্রান্ত কবি-কবি দৃষ্টি নিয়ে ঘাড় কা'ত ক'রে ইংরিজি আর বাঙলা নানারকম সাহিত্যিক বুক্‌নি প্রয়োগ ক'রতে ক'রতে, **Shelley**, **Epipsychidion** আর **The Ideal** আর 'মানসী মূর্তি' আর 'ভাবের সংঘাত' প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রতেন, সে-সব বুঝ্‌তুম না—তাঁদের আমি ঠাট্টা ক'রে ব'লতুম, 'তোমাদের শেলির দল আমাকে গথিক ভাষার ব্যাকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।' যাই হ'ক, নিছক সাহিত্যের চেয়ে, জটিল আধুনিক সাহিত্যের চেয়ে সহজবোধ্য প্রাচীন সাহিত্য আর ভাষাতত্ত্বের কচ্চায়ন এই দু'টির দিকেই একটু ঝোঁক আসে, এবং কখন অজ্ঞাতসারে ভাষার আলোচনাতেই একটা রস পেতে থাকি। সেই জন্যে ইংরিজিতে এম্-এ পড়বার কালে আমি প্রাচীন আর মধ্যযুগের ইংরিজি সাহিত্য আর ইংরিজি ভাষার নাড়ীনক্ষত্রের কথা খুব আগ্রহ্য ক'রে স্বীকার ক'রে নিই। দু'বচ্ছর এম্-এ পড়বার সময়ে, ইংরিজি ভাষাতত্ত্বের খুঁটিনাটি আমাকে ভাল ক'রেই আয়ত্ত ক'রতে হয়। এবং সেই সময়ে একটি জিনিস দেখে মনে আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে—ইউরোপের লোকেরা নিজেদের ভাষা,

যেমন ইংরিজি, জার্মান, ফরাসি, কী নিষ্ঠার সঙ্গে কেমন গভীর-ভাবে আলোচনা ক'রেছে আর তার নষ্টকোষ্ঠী কত কষ্ট ক'রে বা'র ক'রেছে, তাদের মধ্যে যা-কিছু অজানা ছিল তার সব-ই তারা যেন প্রকাশ ক'রে দিতে পেরেছে। আমার মনে এই দেখে একটা হিংসের ভাবও জাগ্‌ত, আর একটা প্রবল ইচ্ছাও হ'ত, এইভাবে আমার মাতৃভাষার ইতিহাসের উদ্ধার হয় না! আমাদের ভাষার প্রকৃতি আর বিকৃতি, আর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে তার গতিশীল ধারার ইতিহাস আমরা তো কিছুই জানি না! মনে একটা উৎকট আগ্রহ হ'ত, আমরা আমাদের ভাষার নানা ব্যাসকূটের সমাধান ক'রতে কবে পারবো! তখন থেকেই মনে এই ইচ্ছা যেন পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠ্‌ছিল, ইংরিজিতে এম্‌-এ পরীক্ষায় পাস ক'রেই মাতৃভাষা বাঙলার ভিতরকার কথা খুঁজে বা'র ক'রতে হবে।

ভারতবর্ষে এখন থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে পাণিনির উদ্ভব হ'য়েছিল। সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব রূপ যেটি আছে, সেটির অভূতপূর্ব বিশ্লেষণ পাণিনি ক'রে দিয়ে গিয়েছেন। সংস্কৃত ভাষায় এই এই নিয়ম কাজ ক'রছে, ভাষার ধ্বনি আর প্রত্যয়গুলির প্রয়োগ এইভাবে হ'চ্ছে, এইসব নিয়ম সর্বত্রই কার্যকরী, আবার এই নিয়মগুলির প্রতিষেধও আছে, আবার এইসব নিয়মের বিরোধী অনেক বৈশিষ্ট্যও আছে—সংস্কৃত ভাষায় যা আছে, তার একখানি সর্বগ্রাহী নিখুঁত বর্ণনা পাণিনি ব্যাকরণে পাই। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার গঠনে এমন অনেক জিনিস আছে, যা কোনও নিয়ম মানে না, আমাদের প্রাচীন বৈয়াকরণেরা তার উল্লেখ ক'রলেও তার কারণ নির্দেশ ক'রেন নি। 'এইরকমটি হয়, এইরকম আদেশ আছে'—এই ব'লেই তাঁরা ক্ষান্ত হ'য়েছেন। কিন্তু আধুনিক ভাষাতত্ত্ব বা বাক্‌তত্ত্ব বিদ্যার যে নবীন বিচার আর প্রয়োগ গত দেড়-শ' বছরের মধ্যে গ'ড়ে উঠেছে, তার এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমে নির্ধারিত হ'য়েছে। আধুনিক বাক্‌তত্ত্বের বিচারের সাহায্যে, সংস্কৃত ব্যাকরণ বা অন্য ভাষার ব্যাকারণের তথাকথিত নিয়ম-

বহির্ভূত নানা ব্যাপারের একটা কারণ-নির্দেশও সম্ভবপর হ'য়েছে। এইভাবে প্রাচীন বৈয়াকরণের বস্তুনিষ্ঠ পরিপূর্ণ আলোচনা এক দিকে, আর-এক দিকে আধুনিক তুলনাত্মক বাক্‌তত্ত্বের সাহায্যে আভ্যন্তর কারণনির্দেশ, তাতে অনিয়মেরও নিয়ম পাওয়া যায়, এই দুইয়ের সঙ্গেই একটু পরিচিত হবার সুযোগ আমার এই ছাত্রাবস্থায় হ'য়েছিল। এম্‌-এ পাস করবার পর এল' 'অন্নচিন্তা চমৎকারা'। সৌভাগ্যবশতঃ ভাল কাজও পেয়ে গেলুম—ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পাঠ ভবনের ইংরিজি বিভাগে প্রাচীন ইংরিজি সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব পড়ানো হ'ল আমার ব্যবসায়। পড়াতে গেলেই লোকে শিখতে আরম্ভ করে, আমারও তাই হ'ল। ইংরিজির সঙ্গে সঙ্গে নিবিষ্টচিত্তে প'ড়্‌তে লাগ্‌লুম অন্যান্য ভাষা। ক্রমে ভারতের আধুনিক ভাষা আর অন্যান্য ভাষা, তা ছাড়া সংস্কৃত আর প্রাকৃতের ভাষাতত্ত্ব, আর ভারতের অনার্য্য-ভাষা প্রভৃতির মোহে প'ড়ে গেলুম।

এই কাজে নেমেই প্রথমেই জান্‌বার আগ্রহ হ'ল—আমাদের দেশের পূর্বাচার্য্যেরা ভাষাতত্ত্ব-সম্বন্ধে কী কাজ ক'রেছেন। সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে পাণিনি ও তাঁর পূর্বগামী ও অনু-গামীরা যা ক'রেছেন তা তো আছেই। তা ছাড়া আধুনিক তুলনাত্মক গবেষণাও আমাদের সামনে আছে। কিন্তু আধুনিক ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে, যেটি আমার প্রধান উপজীব্য ক'রে নিতে চাই সে বিষয়ে কী কাজ হ'য়েছে? পুরোনো বাঙলা ব্যাকরণ খুঁজতে লাগ্‌লুম। হ্যালহেডের বাঙলা ব্যাকরণ, যেটি ১৭৭৮ সালে ছাপা, মানোএল্‌ দা-আস্‌সুম্পসাওঁ-এর পর্তুগীজ ভাষায় লেখা বাঙলা ব্যাকরণ ১৭৪৩ সালে লিসবনে ছাপা, রামমোহনের ব্যাকরণ ১৮৩৩ সালে ছাপা, কেরী সাহেবের বই, শ্যামাচরণ সরকারের লেখা বিরাট বাংলা ব্যাকরণ, চিন্তামণি গাঙ্গুলী আর পরে নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ এঁদের লেখা বাঙলা ব্যাকরণ—এ-সব দেখ্‌লুম। কিন্তু মনে হ'ল রামমোহন আর নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ছাড়া আর

কেউ বাঙলা ভাষার ভিতরকার প্রকৃতি ধ'র্‌তে পারেন নি, বা সেদিকে নজর দেন নি।

এমন সময় পেয়ে গেলুম রবীন্দ্রনাথের বাঙলা-ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধের সংগ্রহ 'শব্দতত্ত্ব'। এগুলির মধ্যে একটি জিনিস দেখে মনে মনে কবির সমীক্ষাশক্তির শত-সহস্র সাধুবাদ দিতে লাগ্‌লুম। এমন ক'রে তাঁর পূর্বে বাঙলা ভাষার বৈশিষ্ট্য আর কারও তো চোখে পড়ে নি! আর বৈশিষ্ট্যগুলি শুধু যে ধ'রেছেন তা নয়, বৈশিষ্ট্যগুলি কেমনভাবে কাজ ক'রছে সে বিষয়ে যেন তাঁর একটা দিব্য দৃষ্টি এসে গিয়েছে। ইউরোপের যে-সব ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত, সাধারণ ভাষা নিয়ে কাজ ক'রেছেন, তাঁদের অনুসৃত পদ্ধতি তো আমার জন্যে তৈরিই ছিল। তা ছাড়া, সহজ মোটা কথা যা আমরা সকলেই জানি, তার ভিতরে কী সূক্ষ্ম ধ্বনি-বিষয়ক বা ভাববিষয়ক রীতি কাজ ক'র্‌ছে, সেটা আমাদের কাছে এ পর্যন্ত অজ্ঞাত থাক্‌ছিল, তার কতকগুলি বিষয়ে ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথেই পাওয়া গেল। এই জন্যেই আমার মনে হ'ল যে, বাঙলা ভাষাতত্ত্বের বা বাঙলাভাষার ইতিহাসের আলোচকদের মধ্যে একজন পাইওনিয়র বা অগ্রণী পথিকৃৎ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বারো বৎসরের পরিশ্রমের পরে যখন আমার বড়ো বই *Origin and Development of the Bengali Language* ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় প্রকাশিত হ'ল, তার ভূমিকায় এই কথা লিখেছিলুম:

The first Bengali with a scientific insight to attack the problems of the language was the poet Rabindranath Tagore, and it is flattering for the votaries of Philology to find in one who is the greatest writer in the language, and a great poet and seer for all time, a keen philologist as well, distinguished alike by an assiduous enquiry into the facts of the language and by a scholarly appreciation of the methods and

findings of the modern Western philologist. The work of Rabindranath is in the shape of a few essays (now collected in one volume) on Bengali phonetics, Bengali onomatopoetics, and on the Bengali noun, and on other topics, the earliest of which appeared in the early nineties, and some fresh papers appeared only several years ago. The papers may be said to have shown to the Bengali enquiring into the problems of his language the proper lines of approaching them.

যাঁরা কেবল ব্যাকরণ নিয়ে চর্চা করেন, অনেক সময় তাঁরা 'সাহিত্য' বোঝেন না। 'সাহিত্য' শব্দের ব্যাখ্যা কেউ কেউ ক'রেছেন —'যা কেবল ব্যাকরণের সহিত পড়া যায়'। নিছক ব্যাকরণকারকে সংস্কৃতে 'শাব্দিক' বলা হয়—শব্দ আর শব্দের বাহ্যরূপ নিয়েই যাঁদের কারবার। 'শাব্দিক' আর 'রসিক' এ দু'জনের মধ্যে চিরন্তন বিবাদ। খ্রীষ্টীয় ১৬৫০ সালের দিকে তামিল দেশের পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দীক্ষিত তাঁর 'শিবলীলার্ণব' নামে সংস্কৃত কাব্যের প্রথম সর্গে শাব্দিক আর তার্কিকদের বেশ একহাত নিয়েছেন। তাঁর সংস্কৃত শ্লোকগুলি বেশ উপভোগ্য। একটি শ্লোকে তিনি ব'লছেন—

স্তোতুং প্রবৃত্তা শ্রুতির্ ঈশ্বরং হি
ন শাব্দিকং প্রাহ, ন তার্কিকং বা।
ব্রূতে তু তাবৎ কবিরিত্যভীক্ষ্ণং,
কাষ্ঠা পরা সা কবিতা ততো নঃ ॥

"শ্রুতি অর্থাৎ বেদ ঈশ্বরের স্তব ক'রতে প্রবৃত্ত হ'য়ে তাঁকে কখনও শাব্দিকও বলে নি, তার্কিকও বলে নি, সর্বদা তাঁকে 'কবি' বলেই বর্ণনা ক'রেছে। এইজন্য আমাদের পক্ষে কবিতাই হ'চ্ছে পরা কাষ্ঠা।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক অদ্ভুত সমন্বয় দেখ্‌তে পাই—তিনি শাব্দিকও বটেন, কবিও বটেন। শব্দ আর অর্থ, উচ্চারিত ধ্বনি আর তার ভিতরের ব্যঞ্জনা, এই দুইয়ের সম্বন্ধেই কবির মনে স্পর্শকাতরতা ছিল। ভাষার নাড়ীনক্ষত্র সম্বন্ধে তাঁর মনে জিজ্ঞাসা ছিল, কিন্তু সে নাড়ীনক্ষত্রের জ্ঞানটাই চরম বস্তু নয়, সে-কথাটা তিনি তাঁর সৃজনী প্রতিভার দ্বারা দেখিয়ে গিয়েছেন। প্রাচীন ভারতের কবি আর সমালোচক রাজশেখর, যিনি খ্রীষ্টীয় নবম শতকের লোক ছিলেন, তাঁর 'কাব্য মীমাংসা'য় ব'লে গিয়েছেন, সাহিত্য-রচয়িতার প্রতিভা দুই প্রকারের,—এক, 'কারয়িত্রী'—যা সাহিত্য সৃষ্টি করে; আর দুই, 'ভাবয়িত্রী'—যা বিচার ক'রে, সমালোচনা ক'রে উপভোগ করে। এই উভয়বিধ প্রতিভাই যে রবীন্দ্রনাথের ছিল, তা বলা বাহুল্য। তা ছাড়া, শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণিয়ার যোগ্য বৈজ্ঞানিক মনোভাবও তাঁর ছিল। যাঁরা কেবল ব্যাকরণের ছোব্‌ড়া নিয়েই কারবার করেন, তাঁরা ব্যাকরণের খুঁটিনাটি আর প্রয়োগের আইন-কানুন নিয়েই মাতামাতি করেন, লেখকদের ধমকও দেন। আমাদের দেশে বহুকাল ধ'রে এই ধারণা চ'লে আস্‌ছিল যে বাঙলা ভাষা আর বাঙলা ব্যাকরণের নিকষ হ'চ্ছে সংস্কৃত ভাষা আর সংস্কৃত ব্যাকরণ। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক দু'জন বিশিষ্ট পণ্ডিত বাঙলাদেশে দেখা দিয়েছিলেন, যাঁরা বাঙলা ভাষার বিশিষ্ট প্রকৃতি ধর্‌বার চেষ্টা ক'রেছিলেন আর জোর গলায় ব'লেছিলেন যে, সংস্কৃতের সব নিয়ম বাঙলায় চ'ল্‌বে না, বাঙলার নিজস্ব স্বরূপটিকে ধ'রে দিতে হবে, যেটি বাঙলাকে চিরকাল ধ'রে সংস্কৃতের সঙ্গে এক দড়িতে বেঁধে রাখ্‌বে না। এই দুইজন মনীষী হ'চ্ছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) আর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)। রবীন্দ্রনাথ ঠিক এঁদের পথেরই পথিক ছিলেন, আর মনে হয় এঁদের চেয়ে আগেই এদিকে তাঁর দৃষ্টি প'ড়েছিল। ভাষাতাত্ত্বিক, শাব্দিক বা ব্যাকরণিয়া ঢঙের বিচার বা মন্তব্য আর

নিষ্কর্ষ বা সমাধান তাঁর প্রথমদিকের কতকগুলি বাঙলা প্রবন্ধে পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধগুলির পত্তন হয় ১৮৮৫ সালে। আর এই প্রবন্ধমালার শেষ প্রবন্ধ বার হয় ১৯৩৮ সালে, যখন বাঙলা ভাষা সম্বন্ধে দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বাংলাভাষাপরিচয়' নামে সংকলিত হ'য়ে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ সাল থেকে কয়েক বছর ধ'রে মাঝে-মাঝে প্রবন্ধে বাঙলা ভাষায় কয়েকটি সমস্যা সমাধানের চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ ক'রেছিলেন। সেই প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ পরে 'শব্দতত্ত্ব' নামে বা'র হয় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। এর পরেও কতকগুলি প্রবন্ধ 'প্রবাসী' ও অন্যত্র বেরোতে থাকে, আর তা ছাড়া বাঙলা ছন্দের উপর তিনি কতকগুলি প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় বা'র করেন। রবীন্দ্রনাথের অন্য সব রচনার তুলনায় এই প্রবন্ধগুলি সাকুল্যে খুব একটা বড়ো ব্যাপার নয়। কিন্তু সেগুলির মধ্যে বাঙলা ভাষার প্রকৃতি, আর বাঙলা ভাষার রীতি আর পদ্ধতি, আর উচ্চারণ-গত, নাম আর ক্রিয়ার রূপ-গত, আর শব্দ-গত বৈশিষ্ট্য তিনি আবিষ্কার করেন আর ধ'রে দিয়ে যান। তাঁর আগে এগুলিকে এভাবে কেউ লক্ষ্য করেন নি। 'শব্দতত্ত্ব'-তে সংকলিত প্রবন্ধগুলিকে বাঙলা ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় এক হিসাবে প্রথম বৈজ্ঞানিক রচনা বলা যায়। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে যে-কোনো ভাষার চারটি মুখ্য বিভাগের সবগুলির সম্বন্ধেই কিছু-না-কিছু নূতন কথা আছে। এই চারটি বিভাগ হ'ল—(১) উচ্চারণ-বানান-ছন্দ—ধ্বনিতত্ত্ব ; (২) সুপ্-তিঙ্-কৃৎ-তদ্ধিত—রূপতত্ত্ব আর শব্দসাধন ; (৩) বাক্যে শব্দের স্থান বা ক্রম—বাক্যরীতি ; আর এ ছাড়া আছে (৪) শব্দের ইতিহাস আর শব্দের অর্থ নিয়ে বিচার। বাঙলা উচ্চারণ বিষয়ক প্রবন্ধে আলোচনা আছে, ক'লকাতার চল্তি বাঙলা -টা-টো-টে নিয়ে—যেমন সাধুভাষায় -টা প্রত্যয়ের চলিত-ভাষায় তিনটি রূপ —সাধুভাষায় 'একটা, দুইটা, তিনটা', কিন্তু চলিত ভাষায় 'একটা, দুটো, তিনটে' ; বাঙলার কতকগুলি স্বরধ্বনির উচ্চারণ, আর তা ছাড়া বাঙলা আর আধুনিক ভারতীয় ভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দের

প্রকৃতি নিয়ে বিচার,—এগুলি একেবারে নূতন ঢঙের আলোচনা। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বাঙলা ধ্বন্যাত্মক শব্দের আলোচনাকে সম্পূর্ণ করেন ১৩১৪ সালে 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'ধ্বনিবিচার' নামে এক উপাদেয় বহু তথ্য ও বিচার পূর্ণ প্রবন্ধে। 'বাংলা শব্দদ্বৈত', 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত', 'সম্বন্ধে-কার' আর 'বাংলা বহুবচন'—এই কয়টি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাংলা রূপতত্ত্ব আর শব্দসাধনের ঐতিহাসিক আলোচনা করবার চেষ্টা করেন। 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধে আবার বাঙলা ভাষার শব্দের দ্যোতনা নিয়ে তিনি কতকগুলি মূল্যবান কথা ব'লেছেন।

রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে ১৯৩৮ সালে রচিত আর প্রকাশিত তাঁর 'বাংলাভাষা-পরিচয়' বইয়ে বাঙলা ভাষার প্রকৃতি আর রীতি সম্বন্ধে আরও কতকগুলি ভাববার কথা ব'লে গিয়েছেন। এই বইয়ে তিনি প্রথমেই ভূমিকাতে তাঁর ভাষাতত্ত্ব আলোচনার প্রেরণা সম্বন্ধে আমাদের ব'লছেন যে, 'মানুষের মনোভাব ভাষাজগতের যে অদ্ভুত রহস্য আমার মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে, তারি ব্যাখ্যা ক'রে এই বইটি আরম্ভ ক'রেছি'। দেখা যাচ্ছে, এইখানে রবীন্দ্রনাথের মনে আছে—ভাষা-সম্বন্ধে রহস্যবোধ, আর সঙ্গে-সঙ্গে ভাষার ব্যাখ্যার চেষ্টা। এই দুইটি জিনিস মিলে, এক দিকে তাঁর রস-রচনা আর অন্য দিকে তাঁর ভাষাঘটিত-রচনা, এই দুই-ই আমাদের মনে একটা কৌতূহল আর তার সঙ্গে-সঙ্গে আত্মতৃপ্তি এনে দেয়। সত্যকার যিনি জ্ঞানী, তাঁর মনের মধ্যে একটা বিনয়বোধ থাকে। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষার বিরাট্ ইতিহাস লিখ্তে বসেন নি, যদি ব'স্তেন তা-হ'লে হয়-তো সে ইতিহাস বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ হ'ত, আর মুষ্টিমেয় ভাষাবিজ্ঞানী তাঁদের সংকীর্ণ গোষ্ঠীতে ব'সে তা নিয়ে কচ্চায়ন ক'রে আনন্দ পেতেন; কিন্তু বিশ্বমানব রবীন্দ্রনাথের রসসৃষ্টি থেকে তা-হলে হয়-তো বঞ্চিত হ'ত। সেটা মানুষের পক্ষে এক পরম দুর্ভাগ্য হ'ত। কিন্তু বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ ইতিহাস না লিখ্লেও তিনি প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক অনুপ্রেরণা

যুগিয়ে গিয়েছেন এই প্রবন্ধগুলিতে। রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর নিজের সম্বন্ধে আক্ষেপ ক'রেই ব'লেছেন, তিনি ভাষা-সম্পর্কে 'ভূগোল-বিজ্ঞানী' ন'ন, যেহেতু তিনি ভাষাবিজ্ঞানীর মতো এ বিষয়ে তলিয়ে অনুশীলন করেন নি। তিনি নিজের সম্বন্ধে ব'ল্‌ছেন, 'আমি যেন পায়ে-চলা পথের ভ্রমণকারী।...বিজ্ঞানের রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দাদের মতো সঞ্চয় জমা হয় নি ভাণ্ডারে, রাস্তায় বাউলদের মতো খুশি হ'য়ে ফিরেছি, খবরের ঝুলিটাতে দিন-ভিক্ষে যা জুটেছে তার সঙ্গে দিয়েছি আমার খুশির ভাষা মিলিয়ে।...জ্ঞানের দেশে ভ্রমণের শখ ছিল ব'লেই বেঁচে গেছি, বিশেষ সাধনা না থাকলেও।' এই যে 'জ্ঞানের দেশে ভ্রমণের শখ', এটা তাঁর মনে ছিল—সেইটাই মস্ত কথা, এবং সে শখটা তিনি অনেকের মনে জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। কাজেই, এক দিকে ভাষার বাহ্যরূপ আর তার ইতিহাস, আর অন্য দিকে ভাষার আভ্যন্তর রূপ আর তার রসপরিপূর্ণ প্রয়োগ, এই দুইয়েরই অপূর্ব সমাবেশ দেখে রবীন্দ্রনাথকে এক কথায় 'বাক্‌পতি' ব'ল্‌তে হয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আর প্রবন্ধে নিহিত তাঁর কারয়িত্রী ভাবয়িত্রী প্রতিভার অনেক কিছু কথা চিরকালের জন্য স্থায়ী হ'য়ে রইল। কিন্তু দৈনন্দিন আলাপে তাঁর যে পরিহাসোজ্জ্বল নানা মন্তব্য আমরা শুন্‌তে পেতুম, তা থেকে ভাষা আর ভাষাতত্ত্ব বাদ পড়ে নি, সেগুলির তো সংগ্রহ হ'ল না। মনে হয়, যদি রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের পাশে যেমন 'শ্রী-ম' ব'সে থেকে নিঃশব্দে তাঁর বচনামৃত লিপিবদ্ধ ক'রে গিয়েছেন, গান্ধীজীর নানা উপদেশ যেমন দিনের পর দিন সংগৃহীত হ'য়ে গিয়েছে—সেই রকমটা যদি রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও হ'ত, আমরা তা-হ'লে তাঁর বিরাট্ ব্যক্তিত্বের একটা কত বড়ো দিক্ পেতে পারতুম! **Rabindranath the Conversationalist** 'সদালাপী রবীন্দ্রনাথ'কে চিরতরে তা-হ'লে ধ'রে রাখা যেত। তাঁর ভাষা আর ভাবকে একাধারে, দ্রাবিড়-দেশে প্রচলিত

একটি সংস্কৃত সমস্তপদ দিয়ে বলা যায়, 'সুগুণ-বিলাস'। নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনার মধ্যে-মধ্যে বাঙলা ভাষার অনেক সমস্যা এবং অপূর্ণতা নিয়েও তাঁর স্বভাব-রসিক মন্তব্যের সঙ্গে, নিজের মত তিনি প্রকট ক'রে গিয়েছেন। আজকাল হচ্ছে সাম্যের যুগ। ইংরিজি আর ফরাসি ভাষায় এক **you** আর **vous**, মধ্যম-পুরুষে সকলের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়, যদিও সেকেলে মতে অত্যন্ত শ্রদ্ধা জানাবার জন্য ঈশ্বরের প্রতি **thou** শব্দের প্রয়োগ ইংরিজিতে পাওয়া যায়, এবং ফরাসিতে যেখানে তুই-তোকারির সম্বন্ধ সেখানে **tu**, **toi** রূপের প্রয়োগ হয়। কিন্তু **you** আর **vous**-এর একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। অতি সম্মানিত ব্যক্তি সম্বন্ধেও **you**, অতি দীন দরিদ্রের সম্বন্ধেও **you**। বাঙলা 'তুই তুমি আপনি'—এ নিয়ে মাঝে-মাঝে বিপদ হয়। 'তুমি' ব'ল্‌বো কি 'আপনি' ব'ল্‌বো এটা যখন ঠিক ক'র্‌তে না পারি, তখন আমরা কর্মবাচ্য বা ভাববাচ্যের আশ্রয় নি—'তুমি কোথায় থাকো' আর 'আপনি কোথায় থাকেন'—এ দুইয়ের টানাটানির মধ্যে প'ড়লে বলি, 'কোথায় থাকা হয়', 'কী করা হয়'। বাঙলায় যদি ইংরিজি ও ফরাসির মতন মধ্যম-পুরুষের জন্য একটা সর্বনামই চলে, সেটা কোন্‌টা হওয়া উচিত? অনেক তর্কের পর ঠিক হ'ল, 'আপনি'-টাই গ্রহণযোগ্য, 'তুমি' নয়, 'তুই' তো নয়ই। যদিও ঘরের লোকেদের জন্য 'তুমি'টা 'তুই'টাও চ'ল্‌তে পারে। ইংরিজিতে **Mrs.** আর **Miss** এ দুইয়ের পার্থক্য বাঙলায় মেয়েদের সম্বন্ধে কী ক'রে জানানো যায়? **Miss** অর্থে তো 'কুমারী' চ'ল্‌ছে, আর **Mrs.** অর্থে 'শ্রীমতী' চ'ল্‌তে পারে। হিন্দী মারাঠী গুজরাটীতে 'সৌভাগ্যবতী' চলে, 'সৌভাগ্যবতী' কি বাঙলায় আমদানি করা যায়? কোনও মহিলাকে উদ্দেশ ক'রে ব'ল্‌তে গেলে, 'মিস্ অমুক, মিসেস, অমুক'-এর জায়গায় কী ব'ল্‌বো? ইংরিজিতে সম্মান দেখিয়ে **Madam** চলে। রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের মত চাইলেন। ম্যাডামের জায়গায় 'ভদ্রে' ব'ল্‌বো? কেউ ব'ল্‌লেন, 'মালক্ষ্মী' কথাটি আবার জীইয়ে তুল্‌লে চলে না? রবীন্দ্রনাথ

ব'ল্‌লেন, 'ভদ্রারা এ বিষয়ে কী বলেন ?' ইংরিজিতে এক-অক্ষর ধাতু ask, পুরোনো বাঙলায় 'পুছ্‌', হিন্দীতে 'পুছ্‌', সংস্কৃত 'পৃচ্ছ' বা 'প্রচ্ছ' থেকে এসেছে। কিন্তু বাঙলায় বলি 'জিজ্ঞাসা করা', আর তার নানা বিকার 'জিজ্ঞেস করা', 'জিগেস করা', 'জিগানো', ইত্যাদি। তিনি ব'ল্‌লেন, 'পুছ্‌' বোধ-হয় আবার ফিরে আস্‌তে চাইবে না—কিন্তু 'শুধানো' এখনও বোধ-হয় চলে, আর 'শুধানো'কে এখনও ফিরিয়ে আনা চলে। 'শুধানো' শব্দটি অনেকেরই মনে লাগে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরে 'প্রবাসী'তে 'শুধানো' ব্যবহার ক'র্‌তে আরম্ভ করেন। এখন দেখা যাচ্ছে, দুই-একজন নামকরা আধুনিক সাহিত্যিক, যেমন শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী, 'শুধানো' প্রয়োগ ক'র্‌ছেন। বাঙলায় 'মুখ' বলিলে ইংরিজি face আর mouth দুই-ই বুঝি। 'মুখ'-এর বিশুদ্ধ (বা তদ্ভব) বাঙলা রূপ 'মু' 'মুহ' অপ্রচলিত হ'য়ে প'ড়েছে; mouth-এর জন্য 'মুখবিবর'—এ দাঁতভাঙা শব্দ লোকে নেবে না। আমি ব'ল্‌লুম, বীরভূমে 'বেঁত' বা 'ব্যাঁত' প্রচলিত আছে, শব্দটা এসেছে 'ব্যক্তি' থেকে, প্রাকৃতে 'বত্ত' তা থেকে পুরোনো বাঙলায় 'বাঁত'. সিন্ধী ভাষায় এ শব্দ পাওয়া যায়, 'ৱাত্তু'। এইরকম অনেক শব্দ আমাদের লোপ পেয়েছে। এরকম স্থানে কী করা যায় ? তাঁর দৈনন্দিন আলাপের মাঝে এইরকম অনেক সমস্যার আলোচনা হ'ত, অনেক সমস্যার সমাধানও তিনি দিতেন সুন্দরভাবে। বাঙলা পরিভাষা-শব্দ সম্বন্ধেও তিনি চিন্তা ক'রেছেন, এবং কতকগুলি শব্দের সুন্দর পরিভাষা তিনি তৈরি ক'রে দিয়েছেন, যেমন, compulsory আর optional—এদের বাঙলা তিনি ক'রেছেন 'আবশ্যিক' আর 'ঐচ্ছিক'। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় এইরকম তাঁর প্রস্তাবিত অনেক পরিভাষা-শব্দ বেরিয়েছিল। একবার বিশ্বভারতীর নিয়মাবলী তৈরির সময়ে প্রশ্ন উঠ্‌ল—advisory council of senior members-এর জন্য কী বাঙলা বা সংস্কৃত পরিভাষা করা যায় ? রবীন্দ্রনাথ একটু ভেবে ব'ল্‌লেন, যদি বলি

'সুমন্ত্রসভা', তা-হ'লে কেমন হয়? আমরা তো আনন্দে প্রায় আত্মহারা হ'লুম। কী সুন্দর শব্দটি তিনি আমাদের ব'ল্লেন! আর এর পিছনে আছে রামায়ণের বয়োবৃদ্ধ মন্ত্রী সুমন্ত্রের অতন্দ্র সেবা আর সৎ-পরামর্শের কথা! এইভাবে রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন আলাপ-আলোচনার মধ্যেও তাঁর 'বাক্‌পতি'-রূপের অনেক বিকাশ আমরা লক্ষ্য ক'রেছি—তার সামান্যই স্থায়ী ভাবে ধ'রে রাখা হ'য়েছে।

কিন্তু যা তিনি দিয়ে গিয়েছেন তাতেই আমরা ধন্য। তাঁর জন্মের এই শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময় বিনম্র কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তিনি যে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন, সেই মহা গৌরবের অধিকারী হ'তে পেরেছি ব'লে ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন-সম্পাদিত, বাক্‌-সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ হইতে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত, 'রবীন্দ্রায়ণ' প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত ॥

বিশ্বমনাঃ বাক্‌পতি

উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্ ;
উত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোতি এনাম্ ।
উতো তুঅস্মৈ তন্বং বি সস্রে—
জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ ॥

দৃষ্টিশক্তি থাকলেই মানুষ বাক্‌কে দেখতে পায় না, শ্রবণ-ক্ষমতার অধিকারী হলেই তাকে শুনতে পায় না ; কিন্তু সুবেশা পতিগতপ্রাণা পত্নী যেমন নিজের স্বামীর কাছে আপনাকে প্রকাশ করে, কোন কোন মানুষের নিকট বাক্ তেমনি নিজ সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই অনন্য ও বিরল চরিত্রের মানুষ যেখানে মানবমহিমা পূর্ণ মাত্রায় ও অখণ্ডস্বভাবে বিরাজমান ; সেই বিপুল মানসিকতার অধিকারী যার প্রসার সুদূরতম দেশে। জীবনকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন তার সমগ্ররূপে ; সমগ্ররূপেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জীবনকে। তাঁর এই উপলব্ধির বিভিন্ন দিককে তিনি বিচিত্র মাধ্যমে প্রকাশ করে গেছেন। জীবনের সঙ্গে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর যে নানা অভিজ্ঞতা জন্মেছে, তার পরিণত প্রকাশকে তিনি মানুষের ভাণ্ডারে "চিরকালের ধন" করে রেখে গেছেন। তিনি শুধুমাত্র একজন সাহিত্যিকই ছিলেন না ; তিনি ছিলেন তারও চেয়ে বেশী। স সর্বজ্ঞঃ, সর্বম্ আবিবেশ—"সকলকে জেনে, সবকিছুরই অন্তরে তিনি প্রবিষ্ট হয়েছিলেন।" তিনি ছিলেন একাধারে কবি ও গীতিকার, সংগীতবিদ্ ও সুরস্রষ্টা। নরনারীর জীবনের আশানিরাশা, সুখদুঃখ, জিজ্ঞাসাসমস্যা এবং সুপ্তজাগ্রত নানা উদ্দেশ্য-অভিপ্রায় তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন ; এরই বর্ণনা ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর কাব্যে উপন্যাসে গল্পে ছবিতে। খ্রীস্টীয় নবমশতকের সংস্কৃত কবি ও সমালোচক রাজশেখর কথিত কারয়িত্রী প্রতিভা এবং ভাবয়িত্রী প্রতিভা—দুটিরই তুল্য অধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রাচীনকাল থেকে যে ক্রমবহমান সাহিত্যের ধারা পৃথিবীর মহত্তম কবি ও দ্রষ্টাগণের দানে পুষ্ট হয়ে এসেছে,

সৃজনশীল লেখকরূপে সে বিভাগে উল্লেখযোগ্য এবং কালজয়ী ভূমিকা গ্রহণ করে তিনি যেমন গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত, সাহিত্যের সমালোচকরূপে তেমনই তাঁর আসন প্রথম সারিতে। মানবজীবনের রহস্যের মতো ভৌতবিজ্ঞানের রহস্যে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। অধিগত করেছিলেন বিজ্ঞানের কতকগুলি মৌল তত্ত্ব। আপন অননুকরণীয় ভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ সেই তত্ত্বকে আবার শিশু ও বয়স্ক সাধারণ পাঠকগণের উপযোগী করে পরিবেশন করে গেছেন। ভাষা ও সাহিত্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি বিজ্ঞানীর দৃষ্টি ও অনুসন্ধিৎসা নিয়ে। বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি একবার বলেছিলেন ; বিজ্ঞান বলতে বোঝায় একটি একক সত্তাকে (entity) ভেঙ্গে তার উপাদানগুলিকে একটি একটি করে বিচার করে এই অখন্ড বিশ্বসংগঠনে তারা কি ভূমিকা গ্রহণ করেছে সেই তথ্যকে পরিজ্ঞাত হওয়া। এ হল বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের দিক। অন্যদিকে বিজ্ঞান আবার সংশ্লেষণীও। কোনো বস্তু বা ভাব বা পদ্ধতির বিভিন্ন অংশ বা স্তর কিভাবে একটি সংহত সম্পূর্ণরূপ লাভ করেছে, এই সম্পূর্ণতায় তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও স্থান কি তার সত্যানুসন্ধানও বিজ্ঞান। কবির সৃজনশীল সাহিত্যেও এই বিজ্ঞানী দৃষ্টি পরিদৃষ্ট হয় ; কিন্তু সব থেকে বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর সমালোচনা সাহিত্যে। সাহিত্যের যত বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল প্রত্যেকটিতে তাঁর প্রয়াস ধাবিত হয়েছে এবং নিজেও কয়েকটি নূতন শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন। সাহিত্যের আঙ্গিনায় তিনি কী বিচিত্র ফসল না ফলিয়েছেন। গীতি-কবিতা, দীর্ঘ-কবিতা, সামাজিক-ঐতিহাসিক-সাংকেতিক নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, গদ্য-কবিতা, সাহিত্যিক-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলী ; আর কী অজস্র সেই ফলন ! রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এ কথা জোর দিয়েই বলা যেতে পারে যে "সাহিত্যের এমন কোনো রূপ ছিল না যা তাঁর প্রতিভার স্পর্শ পায় নি এবং যাকে তিনি ঋদ্ধ করতে পারেন নি

এমন কিছুই তিনি স্পর্শ করেন নি।" কবির সাংগীতিক প্রতিভা ও সিদ্ধি—দুটিই ছিল অনন্য। তাঁর উদ্ভাবিত গায়নরীতি ও সুরশৈলী বর্তমানে 'রবীন্দ্র সংগীত' নামে প্রখ্যাত হয়েছে। বস্তুতঃ, ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে তাঁর নাম হরিদাস স্বামী, গোপাল নায়ক, আমীর খসরু, তানসেন ও ত্যাগরাজের সঙ্গেই উল্লেখ করতে হয়। জীবনের অপরাহ্নে তিনি চিত্রকলার দিকে ঝুঁকেছিলেন; এই প্রবণতা এসেছে তাঁর পারিবারিক এবং পারিপার্শ্বিক ঐতিহ্য থেকে। আত্মপ্রকাশের মাধ্যমরূপে এর তাগিদ তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলা হিজিবিজি ছবি ও স্কেচ্, রঙিন চিত্র ও কম্পোজিশন রেখার উপর তাঁর আধিপত্যের এবং বর্ণ ও আঙ্গিকের উপর একরকমের রহস্যময় আকর্ষণের যে পরিচয় বহন করে এনেছে ভারতের আধুনিক শিল্পকলার ইতিহাসে তা রবীন্দ্রনাথের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দিষ্ট করে রেখেছে। তাছাড়া, অভিনয়কলায়ও তিনি ছিলেন সিদ্ধশিল্পী, নাট্যরচনায় ও নাটক প্রযোজনায় পরম উৎসাহী। আধুনিক ভারতীয় নৃত্যকলা তাঁরই উৎসাহ ও প্রবর্তনায় পুনরুজ্জীবন ও পুনর্বিকাশ লাভ করেছে।

এই সব এবং আরো অনেক কিছু শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্বের জগতে রবীন্দ্রনাথের নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার পরিচয়বাহী। ঋষিসুলভ প্রজ্ঞাদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ; লাভ করে-ছিলেন ইন্দ্রিয়াতীত অপ্রত্যক্ষগোচর সত্তার আভাস। মরমী ও ভক্ত কবি রূপে ভারত ও বিশ্বের মহত্তম দ্রষ্টা, ঋষি ও ভক্তগোষ্ঠীর একাসনে তিনি অধিষ্ঠিত। মানুষের মহিমাকে তিনি সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন, উপলব্ধি করেছেন মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশে দেবত্বের স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের এবং সাহিত্যসৃষ্টির এই বিশেষ দিকটিই বর্তমান যুগের মানুষের কাছে গভীরতম আবেদন বহন করে এনেছে বলে মনে হয়। আলোর অভাবে এ যুগের মানুষ পথভ্রষ্ট এবং যে পরম সত্তাকে সে দেখতে পায়না বা গভীরভাবে

হৃদয়ংগম করতে পারেনা, তাকে অস্পষ্টভাবে অনুভব করছে মাত্র। এখানে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে যে বাণী উচ্চারিত হয়েছে সে শুধু তাঁর একলারই নয়। এর পিছনে রয়েছে তাঁর দেশের প্রাচীন মনীষার বাণী, সে বাণী রয়েছে উপনিষদের বেদান্ত দর্শনে, রয়েছে ভগবদ্-গীতায়। তিনি কেবল প্রাচীন ভারতের সনাতন ধর্ম বা 'শাশ্বত দর্শন' মানবসাধারণের জন্য সহজবোধ্য করে ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন।

রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বের বাস্তবদিকগুলিও এড়িয়ে যাওয়া অথবা লঘু করে দেখা উচিত হবে না। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শিক্ষাব্রতী। সে সময় দেশের মানুষের সেবার চিন্তা তাকে গভীর-ভাবে অধিকার করেছিল। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ম-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তারপর সেই প্রতিষ্ঠান ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দান এবং মানস ও অধ্যাত্ম চর্চায় ক্ষেত্রে মৌলিক ভাব ও চিন্তা বিস্তারের গতিশীল কেন্দ্ররূপে শান্তিনিকেতন পৃথিবীর সাংস্কৃতিক মানচিত্রে স্থান লাভ করে। দেশের মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা যে তার সাংস্কৃতিক ও মানসিক অগ্রগতির বনিয়াদ একথা রবীন্দ্রনাথ বিস্মৃত হন নি। তাই দেশের সাধারণ মানুষের সাহায্যের উদ্দেশ্য নিয়ে শান্তিনিকেতনের নিকটে শ্রীনিকেতনে একটি শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এর নানা উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম হল গ্রামীণ শিল্পকলার উন্নতির মাধ্যমে গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামোটি সুদৃঢ় রাখা। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সকল আন্দোলনের সঙ্গে তিনি সর্বদাই মনে প্রাণে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মসূত্রে জড়িত ছিলেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের আসন ছিল পুরোভাগে। ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা এবং ১৯০৫ সালে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছিলেন জননায়ক। বিবিধ রচনায় ও ভাষণে এবং সর্বোপরি স্বদেশপ্রেমমূলক গানে তিনি সমগ্রজনচিত্ত অনু-

প্রাণিত করে তুলেছিলেন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এমন একটি আদর্শগত পটভূমিকা রচনা করেছিলেন যার অভাবে এই আন্দোলন নিরর্থক ও প্রাণহীণ হয়ে উঠতে পারত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রতী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কোন একটি বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে ভারতের ভাগ্য-বিধাতারূপে কল্পনা করে ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য-বিধান এবং তাঁর নানা ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে সাম্য রক্ষার জন্য ভারতকে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দানের আহ্বান জানিয়ে যে প্রার্থনা সংগীত রচনা করেছিলেন স্বাধীন ভারতে সেই গানটিকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বৃটিশ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদি-গণের অসাম্য, নিষ্ঠুরতা ও শোষণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ প্রতিবাদও ইতিহাসে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে।

আন্তজাতিকতার অন্যতম প্রধান পুরোধা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জাতীয়তার বোধ যার গভীর নয়, যথার্থ আন্তর্জাতিক চেতনা-সম্পন্ন হওয়া তার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই উক্তির সার্থকতার নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। হোমার, ভার্জিল, কালিদাস, শেক্সপীয়ার, গ্যয়টে প্রভৃতির মতো পৃথিবীর মহৎ কবি ও চিন্তানায়কগণের মধ্যে এর সারবত্তা লক্ষিত হয়েছে। তেমনি রবীন্দ্রনাথও ছিলেন গভীর জাতীয়তাবোধসম্প একজন ভারতীয় এবং এমনই একজন ভারতীয় যাঁর মাতৃভাষা ছিল বাংলা। ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং ভারতের সঙ্গে সম্পৃক্ত যাবতীয় মহৎ, শুভ ও স্থায়ী বস্তুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল গভীর ও নিবিড়। কিন্তু উন্নাসিকতা তাঁর ছিল না। "ভ্রান্ত হোক, অভ্রান্ত হোক, আমার দেশ আমারই" বা "আমার জাতি ইতিহাসের প্রাচীনতম ও মহত্তম"—এমন অনুদার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না তাঁর কোন দিন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জাতি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখে আত্মসন্তুষ্টির গজদন্তমিনারে ভারতকে বসিয়ে অপূর্ব স্বাতন্ত্র্যবোধের গৌরব ভুঞ্জনের কোন রকম স্পৃহা ছিল না

রবীন্দ্রনাথের। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যে সব মহত্তম বাণী ও কর্ম উচ্চারিত ও সাধিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাদের ভারতে আবাহন করে আনার পক্ষে। পাশ্চাত্যের ভৌতবিজ্ঞান কি কারিগরী বিদ্যা বা কেবলমাত্র পাশ্চাত্য বুদ্ধিচর্চাকেই নয়, পার্থিব ব্যাপারে, বুদ্ধির ক্ষেত্রে এবং অধ্যাত্মবিষয়ে ভারতকে সমৃদ্ধ করে তুলতে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের অধ্যাত্ম উপলব্ধিকেও গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্নের ভারত, বস্তুত ইতিহাসেরই ভারত ; এই ভারতে সকল সংস্কৃতি, সকল ভাষা ও সকল বিশ্বাস সমাদৃত, এক বিশ্বজনীন সুরসংগতি সৃষ্টির জন্য এখানে তাদের জন্য বিছানো এক গৌরবময় আসন।

এমনই বহুমুখী ছিল রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব। বেদ যাকে বলেছেন—বিশ্বমনাঃ—"যিনি নিখিলব্যাপ্ত মানস, যিনি সার্বিক বোধসম্পন্ন"—রবীন্দ্রনাথকে সেই অভিধায় যথার্থরূপে বর্ণনা করা যেতে পারে। তিনি ছিলেন যথার্থই বিশ্বম্ভর—"যিনি আপন ব্যক্তিত্বে মনুষ্য জগতের সকল কিছুকেই ধারণ করেন।" একটি বহুকোণসমন্বিত অতিকায় হীরকখণ্ডের মতোই ছিল রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব—যার প্রতিটি কোণ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলোর কণা। এই বিচ্ছুরিত ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে যারাই এসেছে আলোকিত হয়ে উঠেছে। তাই নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ নাট্যরসিক ও নাট্যানুরাগীদের সঙ্গে তাদের আপন ক্ষেত্রে মিলতে পারতেন। জীবনের ব্রত হিসাবে যারা শিক্ষাকে কি সমাজসেবাকে একান্তভাবে গ্রহণ করেছে, সেই সমস্ত শিক্ষক ও সমাজবিজ্ঞানীরাও তাই সমাজসেবী রবীন্দ্রনাথ বা শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী ও অনুবর্তী হয়েছে। রাজনীতি ও জাতিগঠন সম্বন্ধে তাঁর সুস্থ চিন্তাধারা থেকে রাজনীতিক প্রেরণা সঞ্চয় করতে পারে, সংকীর্ণ চিত্ত জাতীয়তাবাদী পারে সাধারণ মানুষের হিতের জন্য, সে হিত অবশ্যই ভারতের মানুষকে বাদ দিয়ে নয়, বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব গ্রহণের মতো উচ্চতর চিন্তাস্তরে উঠতে। রবীন্দ্র-

প্রতিভার এই সর্বগ্রাহী বৈশিষ্ট্যই হল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এবং আমার মনে হয় এর পটভূমিতে রয়েছে মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম প্রীতি।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের এত সব বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও নিজের সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই বলে এসেছেন যে তাঁর সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান পরিচয় এই যে তিনি কবি, তিনি গায়ক—মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, ব্যর্থতা বেদনা, স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষার গান গেয়েছেন তিনি, গান গেয়েছেন তার, প্রিয় বলে মানুষ যাকে বুকে আঁকড়ে ধরেছে এবং বর্জনীয় বলে রাখতে চেয়েছে দূরে। কবিরূপে ভাষার মাধ্যমেই তাঁকে আত্মপ্রকাশ করতে হয়। আর খুব স্বাভাবিক কারণে মাতৃভাষা বাংলাকেই তিনি অবলম্বন করেছিলেন। ভারতের চিন্তা ও সংস্কৃতির ভাণ্ডার সংস্কৃত ভাষার উপরও তাঁর আধিপত্য ছিল। সংস্কৃতকে তিনি পেয়েছিলেন অতীতের উত্তরাধিকাররূপে। ইংরেজী ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ছিল ঘনিষ্ঠ। বিশ্বের সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা এই ইংরেজী বহির্জগতের আলোহাওয়া বহন করে এনেছিল ভারতের অচলায়তনের অভ্যন্তরে। এই ভাষাচর্চায় তিনি যুগপৎ আনন্দ ও ফললাভ করেছিলেন। ইংরেজী ভাষার সাহায্যেই বৃটেন, ইউরোপ এবং সমগ্র পৃথিবীর বিশাল সাহিত্যের বিপুল ধনভাণ্ডারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় সাধিত হয়েছিল।

কিন্তু মাতৃভাষাই ছিল তাঁর আত্মপ্রকাশের সর্বাধিক উপযোগী ও শক্তিশালী বাহন। কবির উচ্চতম চিন্তা, মহত্তম অনুভূতি ও অপূর্ব সুন্দর ভাবরাজি, তাঁর কবিতা ও সমালোচনা এবং চিন্তনে-গঠনে-সংহতিতে-উপলব্ধিতে সমুজ্জ্বল উপন্যাস সমূহের অনবদ্য গীতিময় পংক্তিগুলি কবির মাতৃভাষাতেই রচিত। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ভাষাশিল্পীদের তিনি ছিলেন অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলাভাষা ভারতের একটি প্রাদেশিক ভাষামাত্র ছিল, তিনি তার সকল সুপ্তশক্তিকে জাগিয়ে তোলেন। যে মাতৃভাষা ছিল

পিতলের মতো ম্লানদ্যুতি তাকেই স্বর্ণকান্তিতে উজ্জ্বল করে দিয়ে যান রবীন্দ্রনাথ। মধ্যযুগীয় স্থবিরত্ব যে ভাষার প্রায় সর্বাঙ্গ বেষ্টন করে রেখেছিল সেই ভাষারই অবসন্ন ধমনীতে প্রচুর প্রাণরক্ত ও জীবনীশক্তি সঞ্চার করে রবীন্দ্রনাথ তাকে আধুনিক ভাবপ্রকাশে বিশ্বের সকল প্রাগ্রসর ভাষার সমকক্ষ করে তুলেছিলেন। এর জন্যে একদিকে যেমন আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও শিল্পনৈপুণ্যের কাছে ঋণী, তেমনি অন্যদিকে (ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে ইউরোপীয় চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত) বাংলাভাষী মানুষের উপর পাশ্চাত্য চিন্তা ও সংস্কৃতির অভিঘাতের নিকটেও। এই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে দেবগুরু বৃহস্পতির সম্বন্ধে প্রযুক্ত 'বাক্‌পতি' বা 'বাক্যাধিরাজ' নামে ভূষিত করলেই তাঁর কৃতিত্বের পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়।

বস্তুতঃ তিনি ছিলেন যথার্থই 'বাক্যাধিরাজ'। যে 'বাচম্' তার সকল সুপ্ত শক্তি, সকল তেজ, সকল সৌন্দর্য নিয়ে সর্বপ্রথম তাঁর কাছে ধরা দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ যে তাকে অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন তাই নয়, বাংলাভাষার চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও ইতিহাসের উপর আলোক ক্ষেপণে যে কয়জন পূর্বসূরী সাফল্য লাভ করেছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। ১৯২৬ সালে আমার ইংরেজী গ্রন্থ 'The Origin and Development of Bengali Language'-এর ভূমিকায় যা লিখেছিলাম এখানে তা থেকে উদ্ধৃত করছিঃ "বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে যে প্রথম বাঙালী মনীষী ভাষা সমস্যার দিকে চোখ ফিরিয়েছিলেন তিনি কবি রবীন্দ্রনাথ। ভাষাতত্ত্বের অনুরাগীদের কাছে শ্লাঘার বিষয় যে, ইনি একদিকে বাংলাভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক এবং সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি ও দ্রষ্টা; অন্যদিকে একজন তীক্ষ্ণধী ভাষাতাত্ত্বিক, যিনি ভাষারহস্যের সত্য সন্ধানে প্রগাঢ় নিষ্ঠাবান এবং আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষা-তত্ত্ববিদ্‌গণের বিচারপদ্ধতি ও আবিষ্কারসমূহের গুণগ্রাহী। বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান, বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ (onomato-poetics)

বাংলা বিশেষ্য পদ ও অন্যান্য বিষয়ের উপর রবীন্দ্রনাথের গবেষণা কয়েকটি প্রবন্ধের আকারে (বর্তমানে একটি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট) বাহির হয়—এদের প্রথমটির আবির্ভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং মাত্র কয়েক বৎসর আগে আরো কতকগুলি নূতন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলি বাঙালীর কাছে তার ভাষা সমস্যা সমাধানের সঠিক পথ নির্দেশ করে দিয়েছে বলা যেতে পারে।"

আধুনিক ভারতের মহৎ চিন্তানায়কগণের অগ্রণী রামমোহন রায়ও বাংলা ভাষার প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর ব্যাকরণে (১৮২৬ এবং ১৮৩৬ সালে প্রকাশিত) কতকগুলি অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য তিনি লিপিবদ্ধ করে যান। কিছুটা সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন আর কয়েকজন বাঙালী লেখক অবশ্য ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। তাঁদের মধ্যে চিন্তামণি গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৫), নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ (১৮৯৮) এবং হৃষীকেশ শাস্ত্রী (১৯০০) নাম কয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক বাংলাদেশের আর দুটি সুসন্তান বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁদের প্রবন্ধাবলীতে বাংলাভাষা চর্চায় একটি যুক্তিপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তনের প্রয়াস করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সহজেই রামেন্দ্রসুন্দর ও হরপ্রসাদের পথের অনুবর্তী হন এবং বাংলা সাহিত্যের সর্বজনস্বীকৃত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরূপে তাঁর প্রভাব দিয়ে মাতৃভাষা ও তার গতিপ্রকৃতির সঠিক মূল্যায়নে আগ্রহী বুদ্ধিমান বাঙালী সাধারণের মানসিকতা প্রস্তুতিতে সাহায্য করে—অবশ্য গোঁড়া মানসিকতাসম্পন্ন পণ্ডিতেরা দূরত্ব বজায় রেখেই চলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের বলেছেন যে, বাংলা তাঁর মাতৃভাষা বলে এবং চেনা পরিবেশ থেকে সচেতন প্রয়াস ছড়াই তাকে গ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে এ ভাষা সকলের

পক্ষেই সহজবোধ্য। কিন্তু কোন এক সময় জনৈক অবাঙালীকে এই ভাষা শেখাতে গিয়ে তিনি দেখতে পান যে, এই সহজ ভাষাটিরই নানা অব্যাখ্যাত জটিলতা মাথা ঠেলে দাঁড়াতে শুরু করেছে। এই সমস্যা তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। তখনই এ সম্পর্কে তথ্য ও উদাহরণ সংগ্রহে লেগে যান। তাঁর এই গবেষণা থেকেই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার প্রামাণিক কথ্যরূপের ধ্বনিবিজ্ঞানের মৌল নিয়মগুলি নির্দিষ্ট হয়। বাংলাভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি একটি বিশেষ স্বভাবের বাগ্‌রীতি; এই রীতি ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্যান্য শাখা এবং দ্রাবিড়ীয় ও অষ্ট্রীয় ভাষাসমূহেও দৃষ্টিগোচর হয়। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই শ্রেণীর শব্দগুলির প্রকৃতি ও কার্যকলাপ নিরূপণ করেন। এই গবেষণায় রবীন্দ্রনাথের মৌলিক প্রবন্ধটি অন্য আর এক দিক থেকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কর্তৃক সার্থকভাবে সম্পূরিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই প্রাথমিক প্রচেষ্টার খুঁটিনাটির মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। হয়তো এই বিভাগে তাঁর সত্যকার দানের পরিমাণ খুব বেশী নয়—মোটামুটি একটি যোগসূত্রে গ্রথিত কয়েকটি এলোমেলো প্রবন্ধের সমষ্টি। উল্লেখিত প্রবন্ধগুলি পরবর্তী কালে 'শব্দতত্ত্ব' নামে পুস্তকাকারে ১৯০১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রবন্ধগুলির মূল্য ভাষাচর্চার সূত্রপাতে এবং সঠিক পথনির্দেশনায়। এখানেই রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব। আধুনিক ইন্দো-আর্য ভাষাসমূহের প্রথম তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা করে যিনি "আধুনিক ইন্দো-আর্য ভাষাবিজ্ঞানের জনক" পদবাচ্য সেই John Beames কৃত বাংলা ব্যাকারণের একটি রসপূর্ণ সমালোচনাও করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কী গভীর নিষ্ঠায় যে রবীন্দ্রনাথ ভাষাবিজ্ঞান এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের তুলনামূলক ব্যাকরণ চর্চা করেছিলেন তার উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই বিষয়ে শিক্ষিত বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত Karl Brugmann কৃত চার খণ্ডে সমাপ্ত বিরাট গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ তিনি

পড়েছিলেন। কবির নিজের হাতে পেনসিল চিহ্ন দেওয়া ও মন্তব্য লেখা সেই গ্রন্থের একটি খণ্ড শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারে আমি দেখেছি।

প্রসঙ্গত বলা উচিত যে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনে কোনসময়ই ক্ষুণ্ণ হয়নি। বালক বয়সেই বিজ্ঞানে তাঁর হাতে খড়ি। এই সময় কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আকাশের গ্রহনক্ষত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯২৭ সালে তিনি মালয়, ইন্দোনেশিয়া ও শ্যামদেশ ভ্রমণে বহির্গত হন, সে সময় তাঁর ভ্রমণসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই ভ্রমণে বেরিয়ে পড়াশুনো করার জন্যে তিনি কলকাতার বড়ো বড়ো বই-এর দোকান ঘেঁটে বহু বই কিনে-ছিলেন। এর মধ্যে ছিল **Today and Tomorrow** গ্রন্থমালার আঠারো থেকে কুড়ি খণ্ড বই। ইংরেজীতে লেখা বিজ্ঞান-বিষয়ক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থমালায় ভৌতবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সর্বাধুনিক তথ্যের আলোচনা থাকত। কবির এই জ্ঞানলিপ্সা আমাতেও সংক্রামিত হয় এবং আমি এদের মধ্যে অন্তত আধ-ডজন বই পড়ে ফেলার সময় ও সুযোগ পেয়েছিলাম।

বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও সমস্যার চর্চায় রবীন্দ্রনাথ কখনই ক্ষান্ত হন নি এবং সময় ও সুযোগ মতো এই বিষয়ে ভাবনা-রসোজ্জ্বল প্রবন্ধ রচনা করে এসেছেন। বাংলা ছন্দের জটিল প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা করেছেন আপন বিশিষ্ট ভঙ্গীতে। কবির আলাপ-আলোচনায়, বিশেষ করে আমি যখন তাঁর সঙ্গে থাকতাম, বাংলা ব্যাকরণের নানা বৈশিষ্ট্য ও সমস্যার অবতারণা হত এবং আমরা সর্বদাই কবির মতামত ও উক্তি থেকে নতুন আলোকলাভের অপেক্ষায় থাকতাম; কবিও সরস কৌতুকবিচ্ছুরিত অনবদ্য ভঙ্গীতে সর্বদা আমাদের আশা চরিতার্থ করতেন। আমার লেখা **The Origin and Development of the Bengali Language** গ্রন্থখানি পাঠ করে কবি আমার প্রতি পরম সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

আমার পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের কথা এই যে, এই গ্রন্থে অনুসৃত আমার দৃষ্টিভঙ্গী, বিচারপদ্ধতি ও গৃহীত সিদ্ধান্ত কবির প্রশংসা অর্জন ও সমর্থন লাভ করেছে। কতকগুলি রচনায় কবি তা প্রকাশকও করেছেন। আমার এই কাজের জন্য যে তিনি আমার প্রতি বিশেষ স্নেহ পোষণ করতেন তার প্রচুর নিদর্শন আমি পেয়েছি।

কবির এই স্নেহ আমার জীবনে এক পরম গৌরব। কিন্তু আমার বিশ্বাস কবির স্নেহের উৎস রসবর্জিত শুষ্ক পাণ্ডিত্যে নয়, বরং, মানুষ ও তার পরিবেশের প্রতি আগ্রহই যে আমার ভাষাচর্চার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত এই ধারণাই তাঁর স্নেহের মূলে। এ বিষয়ে আমার নিজের স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরই প্রথমে এদিকে দৃষ্টি পড়ে এবং তখনই আমি এ বিষয়ে সচেতন হই। আমার এত সব কথা বলার উদ্দেশ্য হল, মানবপ্রীতিই যে কবিকে ভাষার উদ্ভব ও কার্যকলাপের প্রতি আগ্রহশীল করে তোলে সেই সত্যটির উপর গুরুত্ব আরোপ করা।

বাংলাভাষা সম্বন্ধে কবির পরবর্তী কালের আলোচনা ১৯৩৮ সালে গ্রন্থাকারে 'বাংলাভাষা পরিচয়' নামে প্রকাশিত হয়। বইটি কবি আমার নামে উৎসর্গ করেন এবং উৎসর্গপত্রে আমাকে 'ভাষাচার্য' বলে আখ্যাত করেন। কবির দেওয়া এই অনুষ্ঠানহীন উপাধি আমি পরম মূল্যবান জ্ঞান করে সগর্বে নিজের নামের সঙ্গে ব্যবহার করে আসছি। যথার্থ পণ্ডিতজনোচিত বিনয় প্রকাশ করে কবি এই গ্রন্থে নিজেকে "পায়ে-চলা পথের ভ্রমণকারী" বলে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ভাষারাজ্যের রাজপথ ও গলিপথে বিচরণ করে তিনি আপন মতামত ব্যক্ত করে চলেছেন, উদ্দেশ্য পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষারাজ্যের অনুরূপ ভ্রমণরসিক গড়ে তোলা। গ্রন্থটির সূচনায় তিনি লিখেছেন,

> "মানুষের মনোভব ভাষাজগতের
> যে অদ্ভুত রহস্য আমার

মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে
তারই ব্যাখ্যা করে এই
বইটি আরম্ভ করেছি।”

তাই দেখি, কবির মধ্যে বাক্‌রহস্যের প্রতি বিস্ময়বোধ যেমন বিদ্যমান, তেমনি সেই রহস্যকে ভেদ করবার সচেতন ইচ্ছা ও প্রয়াস। অন্যান্য আর অনেক বিষয়ের মতোই ভাষারাজ্যেও রবীন্দ্রনাথ তাই সমান মরমী, সমান চিন্তাশীল, সমান বিজ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন।

প্রবন্ধের প্রথম উদ্ধৃত ঋগ্বেদের সূক্তটির অনুপম বর্ণনা অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ সত্যকার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বাক্‌কে দর্শন ও শ্রবণ করেছিলেন এবং বাক্ ও তার সকল মাধুর্যে মণ্ডিত হয়ে, পতি ও বল্লভ সকাশে প্রেমমুগ্ধা জায়ার মতোই কবির কাছে ধরা দিয়েছিলেন। সকল দিক দিয়ে তিনি তাই বাক্‌পতি, বাগ্‌বল্লভ। বিশ্বের যা কিছু মানুষের কৌতূহলের সামগ্রী সে সমস্ত দিকেই ধাবিত হয়েছে কবির বাধামুক্ত মন; বাক্‌প্রীতি কবির সেই বিপুল বিস্তৃত মানসিকতারই একটি অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ তাই বিশ্বমনাঃ, আবার বাক্‌পতিও॥

‘শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ’ গ্রন্থে মুদ্রিত।

ভারতীয় সংগীত

ও

রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বমনাঃ রবীন্দ্রনাথ-৪

রবীন্দ্রনাথ একবার আমায় লিখেছিলেন—'প্রকাশ আমার ধর্ম'। কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে যেমন আমার প্রকাশ এক দিকে হ'য়েছে, তেমনি গানে আর সুরেও হ'য়েছে, ছবি-আঁকায় হ'চ্ছে, আর নাট্যাভিনয়েও হ'য়েছে।' বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথের অদ্ভুত আর বিশ্বন্ধর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এত বিভিন্ন পথ ধ'রে ঘটেছিল যে, ভাব্‌লে বিস্মিত হ'তে হয়। যে কয়টি পথের কথা তিনি নিজে উল্লেখ ক'রেছিলেন, সে কয়টি ছাড়া তাঁর ব্যক্তিত্ব বা প্রতিভা আরও কত বিভিন্ন প্রকারের কর্মে বা চেষ্টায় আপনাকে প্রকাশিত ক'রেছিল! কবি, ঔপন্যাসিক, নৈবন্ধিক—তাঁর এই-সমস্ত সাহিত্যিক পরিচয় তো বিশ্ব-বিখ্যাত, এবং তাঁর প্রথম ও প্রধান পরিচয় ছিল কবি ও লেখক হিসাবেই। কিন্তু তাঁর স্বদেশ-বাসী এবং স্বভাষা-ভাষীদের সকলেই সংগীতকার—'বাগ্‌গেয়কার' আর 'কলাবিশুদ্ধ গীতির স্বর-সংযোগের স্রষ্টা'—ব'লে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে শ্রদ্ধা ক'রে আর ভালোবেসে এসেছে। যাঁদের সে সৌভাগ্য জীবনে ঘ'টেছে, তাঁরা নাট্যাভিনয়ের প্রযোজক আর নাট্যাভিনেতা হিসাবেও রঙ্গমঞ্চে তাঁকে দেখেছেন; আর তাঁরা স্বীকার ক'র্‌বেন যে—সেখানেও তাঁর প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ। তাঁর কলমে আঁকা অদ্ভুত রসের ছবিগুলির মধ্যে এক-একখানি মানুষের মুখ আবার অপূর্ব মানবিকতা-রসে ভরপুর ছিল—অল্পসংখ্যক সমঝ-দার রসিকজনের কাছে সেগুলি সম্মানলাভ ক'রেছে: শিল্পীরাও তাঁর হাতের কাজ এইসব ছবির সমাদর ক'রেছেন। নীরস শব্দ-তত্ত্বের আলোচনায় তিনি বাঙলা ভাষায় পথিকৃৎদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিলেন, শাব্দিকেরাও এবিষয়ে তাঁকে তাঁদের একজন প্রধান নেতা ব'লে মেনে নিয়েছেন। এ-সমস্ত বিদ্যা আর সুকুমার শিল্পের বাইরেও তাঁর একটা বিরাট কর্মি-জীবন ছিল, তার পুরা আলোচনা এখন সম্ভবপর হবে না। তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে চিন্তা আর কর্ম দুই পথেই নিজের শক্তি সার্থক ভাবে নিয়োজিত ক'রেছিলেন। তিনি শিক্ষাব্রতী এবং আদর্শ শিক্ষক ছিলেন—

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় তাঁর কৃতিত্বের পরিচায়ক। কৃষি, শিল্প আর শিল্প-বিষয়ক তাঁর উদ্যোগ শ্রীনিকেতনে দেখা দিয়েছিল। নিখিল ভারতের রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে তিনি মহাত্মা গান্ধীর পাশেই অবস্থিতি ক'রে এসেছেন। বিভিন্ন জাতির মানুষকে মিলিয়ে দেবার পথে যে-সমস্ত শক্তি বিগত শতকপাদের অধিক ধ'রে কাজ ক'রে এসেছিল, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই সমস্ত শক্তির এক প্রধান উৎস—আর বোধ হয়, সারা পৃথিবীর এত নানা জাতি আর সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে, তাঁর রচনা আর তাঁর বিশ্বমানবিকতার বাণীর জন্য, তিনি ছাড়া আর কেউ এতটা প্রিয় আর এতটা আপনার হ'তে পারেন নি।

সংগীতকার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সংগীত বিষয়ে অনভিজ্ঞ আমার মতো লোকের কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। তবে আমি নিজেকে, রবীন্দ্রনাথ যাঁর পরিচয় বাঙালী পাঠক-সমাজে করিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, সেই 'উকীল শ্রীযুক্ত দুকড়ি দত্ত' মহাশয়ের সঙ্গে পুরোপুরি এক পর্যায়ের মানুষ ব'লে মনে করি না, কারণ সত্য-সত্যই আমার 'গান জিনিসটা শুনতে বড়ো ভালো লাগে'। কেন ভালো লাগে, তার বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা কখনও করি নি ; তবে কী ভালো লাগে, ধীরে ধীরে তার একটা বিচার ক'র্‌তে পেরেছি। রাগ বা সুরের জ্ঞান আমার নেই, 'কানেড়া রাগ' কি 'নাকেড়া রাগ', তাও ঠাওর ক'র্‌তে পারি না। তবে একটা জিনিস ছেলেবেলা থেকেই আমাকে পেয়ে ব'সেছে—সেটা হচ্ছে ধ্রুপদের সবল স্নিগ্ধ-গম্ভীর স্বররেখার সমাবেশ।

তখন আমার আট নয় বছর বয়স, এখন থেকে ৪৪।৪৫ বছর পূর্বেকার কথা। আমার বাড়ি হাওড়া শহরের অন্তর্গত শিব-পুরে—তখন শিবপুর ছিল একখানি বর্ধিষ্ণু গ্রাম, তার নিজ বিশিষ্টতা আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল ; এই গ্রাম বহু চটকলের আর পশ্চিমা কুলীদের ধাক্কায়, শালিমার কারখানার আর রেল-লাইনের চাপে, এখন **Cosmopolitan Greater Calcutta**-র

এক বিশিষ্টতা-বিহীন অংশ মাত্র হ'য়ে প'ড়্ছে। তখন শিবপুর ছিল বাঙলা দেশের হৃদয় আর মস্তিষ্ক স্বরূপ ভাগীরথীতীরবর্তী ভদ্রগ্রামগুলির মধ্যে অন্যতম ; এখানে ভাগ্যবানদের ঘরে বারো মাসে তেরো পার্বণ ছিল, কথকতা আর 'শখের যাত্রা'র পাট ছিল (এক নগর-কীর্তন ছাড়া বৈঠকী রস-কীর্তন তখন প্রচলিত হয়নি), সংস্কৃত-বিদ্যার চর্চা ছিল—আর ছিল, উচ্চ অঙ্গের সংগীতের চর্চা। 'কাণা নিকুন' নামে' পরিচিত অন্ধ গায়ক নিকুঞ্জবিহারী দত্ত তখন শিবপুরের বিখ্যাত গায়ক ছিলেন, ক'লকাতা থেকে, আর অন্য দূর-দূর জায়গা থেকে তাঁর ডাক আস্ত ; আর অন্য নামী কালোয়াত গায়ক অনেকগুলি ছিলেন, পাখোয়াজী অনেক ছিলেন —তাঁদের নাম ছেলেবেলায় শুনেছি, তাঁদের কতবার মামার বাড়িতে দেখেছি, গানবাজনাও তাঁদের অনেক শুনেছি—কিন্তু অন্য কারও নাম মনে রাখতে পারি নি। আমার দুই মামা ছিলেন, দুজনেই কালোয়াতি গানের সাধক ছিলেন। তাঁদের আমলে, মামার-বাড়িতে প্রায়ই শনিবার রবিবার গানের মজলিস ব'স্ত ; যে-সময়ে মায়ের সঙ্গে আমরা মামার-বাড়িতে যেতুম, সে-সময়ে এ-সব মজলিসের এক পাশে উপস্থিত থাক্বার সৌভাগ্য আমাদের হ'ত। ১৮৯৯ সাল, তখন আমার বয়স আট-নয় বছর, ক'লকাতায় তখন ভীষণ প্লেগের প্রকোপ—আমরা প্রায় একটি বছর শিবপুরে মামার-বাড়ির কাছেই মামাদের একটি বাড়িতে ছিলুম, আমার পিতা শিবপুর থেকে নৌকো ক'রে ক'লকাতায় আপিস ক'র্তেন, তখন এই-সব গানের জলসায় সপ্তাহে দু-বার ক'রে অন্তত জমা হতে পার্তুম। অন্যান্য মাসতুতো ভায়েদের সঙ্গে, বাড়ির ভাগ্নে হিসাবে আমাদের প্রতিপত্তি আর দাপট ছিল খুবই। কর্তা ব্যক্তিদের অসাক্ষাতে তানপুরা খোলা পেলেই তার নিয়ে টানাটানি, আর পাখোয়াজের ময়দার তাল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি আর লোফালুফি এ-সব তো ছিলই। কালোয়াতি গানের—ধ্রুপদ আর খেয়ালের—চর্চা যখন হ'ত, সব সময়ে যে ভালো লাগ্ত তা ব'ল্তে পারি না ; টপ্পা অবধি চ'লত, বোধ

হয় এঁরা ঠুম্রি-গজলে নাম্‌তেনই না—সে-সব তখন শুনি নি। মাঝে মাঝে বাঙলা গান হ'ত (পরে বুঝেছি যে সে-সব ছিল নিধু-বাবুর টপ্পা) ; আর কেউ হয়তো বাড়ির মেয়েদের খুশি কর্‌বার জন্য এক আধখানা 'শ্যামা সংগীত' গাইতেন ; ধ্রুপদ খেয়ালের গণ্ডি কখনও কখনও এই ভাবে দয়া ক'রে কেউ অতিক্রম ক'র্‌তেন। এক-এক সন্ধ্যায় বড়ো গোছের জলসা হ'ত, তখন নানা লোক আসতেন, মামার বাড়ির সামনের সরু গলিপথে অনেকগুলি ঘোড়ার গাড়ি জমা হ'ত। রবিবার দিন কখনও কখনও সারা দিন ধ'রে গানের মজলিস চ'ল্‌ত—গায়ক বাদকদের কেউ কেউ থেকে যেতেন, মামার-বাড়িতেই তাঁদের মাধ্যাহ্নিক সেবা হ'ত। তখন চায়ের রেওয়াজ ছিল না, পান তামাক হরদম চ'লত।

এই রকম সংগীতের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাল্যকাল অতি-বাহিত হ'চ্ছিল। এক দিন বর্ষাকালের দুপুর বেলা, আকাশে খুব মেঘ জ'মেছে, বৃষ্টিও ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ ক'রে প'ড়্‌ছে, বাইরে গিয়ে দৌড়ধাপ করে খেলবার সময় সেটা নয়—তখন আধখানা না'রকেল-মালায় দড়ি বেঁধে খড়ম ক'রে প'রে, খড়মে-বাঁধা দুই দড়ি দু'হাতে ধ'রে সেই খড়ম পায়ে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ক'র্‌তে-ক'র্‌তে ছোটাছুটি করা শিবপুর গ্রামের ছেলেদের একটা প্রিয় খেলা ছিল—মামার-বাড়ির বৈঠকখানায় অন্ধ নিকুঞ্জ দত্ত তানপুরা নিয়ে ধ্রুপদে একখানা মেঘ-মল্লার ধ'রেছেন, একজন পাখোয়াজ ধ'রেছেন, আর অন্য দু-তিনটি মাত্র শ্রোতা চুপ ক'রে শুন্‌ছেন—সেই ধ্রুপদখানি-ই যেন তখন-ই আমায় চিরতরে ভারতবর্ষের ধ্রুপদ সংগীতের কেনা গোলাম ক'রে নিলে—

ঘোরে ঘোরে বরখত বদরবা।

ধ্রুপদের মোহ কখনও কাটিয়ে' উঠ্‌তে পারি নি। বহুদিন পরে, আমার এক মামাতো ভগিনীপতি, শিবপুরের ছেলে ব'লে তিনিও উচ্চাঙ্গের সংগীতের চর্চা ক'র্‌তেন, তাঁর কাছে অনুরোধ

ক'রে তাঁর চমৎকার কণ্ঠে গাওয়া দু'-চারখানি ধ্রুপদ বার-বার শুনেছি—

তীন গ্রাম সপ্ত সুর ইকইস মুরছনা। প্রভৃতি।

ক'লকাতায় সুকিয়াস্-রো-তে আমাদের বাড়ির পাশেই সংগীত-নায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাসা নিলেন, তখন কয়েক বছর ধ'রে তাঁর ওখানে ধ্রুপদ-খেয়ালের জলসায় হাজির থেকে সংগীত-রস আস্বাদের সুযোগ হ'য়েছিল।

ধ্রুপদ ভালো লাগ্‌বার কারণ বোধ হয়, সরল এবং নিরাভরণ সৌন্দর্য্যের প্রতি, **grand style**-এর রচনার প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ; যে-জন্য প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য্য, হিন্দুযুগের মহাবলিপুরম্ আর ঘারাপুরীর ভাস্কর্য্য, পৃথিবীর সব জাতির বড়ো-বড়ো উপাখ্যান বা মহাকাব্য; অনাবশ্যক বচন-বিস্তার বা ভাবের মার-পেঁচ না দেখিয়ে সহজ সোজা ভাবে অনুভূত আর চীনা কবিতার মতো সরল কবিতার রূপে প্রকাশিত রস-বস্তু; বাস্তুশিল্পের বিরাট্-বিরাট্ সৃষ্টি-সমূহ—যেমন গ্রীক দোরীয় রীতির মন্দির, হুমায়ুনের সমাধিমন্দির, তাজ, প্রাচীনতম যুগের বিজান্তীয় ও গথিক গির্জা, বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর মন্দির, তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দির;—এই-সব জিনিস ভালো লাগে। বিশেষ ক'রে তানসেনের ধ্রুপদ কেন ভালো লাগে, তার একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা ক'রেছিলুম কয়েক বৎসর পূর্বে, 'কবি তানসেন' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধে ('প্রবাসী'র ১৩৪০ সালের বৈশাখ মাসের সংখ্যায় এটি বেরিয়েছিল)।*

প্রাচীন ভারতের সংগীতের পুরাতন কোনও নমুনা এ পর্য্যন্ত সুরক্ষিত হয় নি। প্রাচীন ভারতীয় নাচের একটা ধারণা ক'র্‌তে পারা যায়, উদয়গিরি ভারহুৎ সাঁচীর আর মথুরা অমরাবতীর খোদিত চিত্র থেকে, অজণ্টা বাঘ গুহার আঁকা ছবি থেকে।

* 'ভারত-সংস্কৃতি' নামক প্রবন্ধ-সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণে (বঙ্গাব্দ ১৩৭০) এই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

সামগানের যে ধারা এখনও পর্য্যন্ত চ'লে এসেছে, তা থেকে এক ধরনের অতি বিশিষ্ট ধর্ম-সংগীতের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। সাওঁতাল মুণ্ডা টোডা প্রভৃতি অনুন্নত জাতির স্বকীয় গানের সুর থেকে ভারতের আদিম অধিবাসীদের গানের ধাঁজটাও অনুমান করা যায়। সংগীত সম্বন্ধে প্রাচীনতম সংস্কৃত বই কোনোটিই খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর ওদিক্‌কার নয়। খ্রীষ্ট-জন্মের প্রথম দুই-তিন শতকের মধ্যে লেখা শূদ্রকরাজার 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে, নায়ক চারুদত্ত অনেক রাত ধ'রে গান শুনে বাড়ি ফির্‌ছেন —তিনি পথে চ'ল্‌তে-চ'ল্‌তে সঙ্গী বিদূষক মৈত্রেয়ের কাছে উচ্ছ্বসিত ভাবে রেভিলের প্রশংসা ক'র্‌ছেন—

রক্তং চ নাম মধুরং চ সমং স্ফুটং চ
ভাবান্বিতং চ ললিতং চ মনোহরং চ।
কিংবা প্রশস্তবচনৈর্বহুভির্মদুক্তৈর্
অন্তর্হিতো যদি ভবেদ্, বনিতেতি মন্যে॥

তার গান এত সুন্দর যে, যদি গায়ক চোখের বাইরে থাকেন, মনে হয় কোনও নারী গাইছে। এতে গানের পুরুষোচিত গাম্ভীর্য্যের চেয়ে মহিলোচিত মাধুর্য্যের প্রশংসাই দেখ্‌ছি। এ জিনিস মৈত্রেয়ের ভালো লাগে নি—তিনি ব'ল্‌ছেন—

মণুস্‌সো বি কাঅলীং গাঅন্তো, সুক্‌খ-সুমণো-দাম-বেট্‌ঠিদো বুড্‌ঢ-পুরোহিদো বিঅ মন্তং জবন্তো, দিঢং মে ণ রোআদি॥

'পুরুষ-মানুষ যদি কাকলি গায়, তাহ'লে শুক্‌নো ফুলের-মালা মাথায় জড়িয়ে বুড়ো পুরোহিতের মন্ত্র-জপ করার মতন, আমার তা মোটেই ভালো লাগে না।'

বীণা বাজিয়ে উজ্জয়িনীর বিদগ্ধজন-সভায় ভাব-রেভিল যে গান গেয়েছিলেন, তার ঠাট কী ধরনের ছিল, তা জান্‌বার উপায় নেই। দুষ্যন্তের অন্যতমা রানী হংসপদিকা বীণা বাজিয়ে যে 'বর্ণপরিচয়' বা মূর্ছনা রাজাকে উদ্দেশ্য ক'রে শোনাচ্ছিলেন,

তাও কী ধরনের ছিল তা ব'ল্‌তে পারা যায় না। মহাকবি বাণভট্ট অরণ্যের মধ্যে শিবের মন্দিরের অলিন্দে তরুণী তাপসী মহাশ্বেতার গানের বর্ণনা ক'রেছেন—শ্রীযুক্ত [অধুনা পরলোকগত] প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের গদ্য-কবিতাময় সুন্দর বঙ্গানুবাদে সেই বর্ণনাটুকু উদ্ধার ক'রে দেবার লোভ সংবরণ ক'র্‌তে পার্‌ছি না—

সেই মেয়েটির কোলের উপর, চন্দ্রাপীড় দেখ্‌তে পেল, প'ড়ে রয়েছে হাতীর-দাঁতে গড়া একখানি বীণা। দক্ষিণ করের অঙ্গুলিগুলি বীণার তারের উপর লীলাভরে চ'লেছে খেলে, আর কম্পিত অধরের অবকাশ দিয়ে ঝ'রে প'ড়্‌ছে দেব বিরূপাক্ষের বন্দনাগান —সেই বীণাতন্ত্রীঝংকারমিশ্র অমানুষিক সুরলালিত্য।

সাক্ষাৎ যেন গন্ধর্ববিদ্যা।

গীতরবে আকৃষ্ট হ'য়ে মন্দিরদ্বারে স্থির হ'য়ে ব'সে আছে মৃগ বরাহ সিংহ—

অনেক প্রাণী—আর বীণার ঝংকারে মাঝে মাঝে উঠ্‌ছে সেই অষ্টাদশবর্ষীয় প্রবাল-অধরের গান।

চন্দ্রাপীড়ের মনে হ'ল—

"......যে গান শুন্‌ছি সে গান মর্ত্যের নয়—নিশ্চয় গন্ধর্বলোকের।..."

তারপরে সমাপ্ত হ'ল গীত।

স্তব্ধ হ'ল বীণা, যেন শান্ত হ'ল কুমুদিনীকে ঘিরে ভ্রমরের মধুগুঞ্জন।

মেয়েটি তখন উঠে শিবপ্রদক্ষিণ ক'রে নত হ'য়ে প্রণাম ক'র্‌ল।

এই রকম গানের সুর-লয় যদি পাওয়া যেত! কিন্তু সে কণ্ঠস্বর সে বীণাধ্বনি চিরতরে স্তব্ধ—তার ক্ষীণ ধারা হয়তো আমাদের মধ্য-যুগের সংগীতে একটু-আধটু ঝংকৃত হ'চ্ছে।

উত্তর-ভারতের রাজপুত ছবি থেকে, পশ্চিম-বাঙলার শ্রেষ্ঠ পুঁথির পাটা থেকে, যেমন বাঘ অজন্টার ভিত্তি-চিত্রের ধারণা, ঘারাপুরী-কৈলাস-মহাবলিপুরম্-বাদামীর, মথুরা-অমরাবতী আর ভারহুৎ-সাঁচীর খোদিত চিত্রের। ধারণা, সম্পূর্ণ ভাবে করা যায় না ; তেমনি বোধ হয় আকবর তানসেনের সময়ের, খ্রীষ্টীয় ১৬-র শতকের, হিন্দু সংগীত ধ্রুপদ থেকে (যে ধ্রুপদ গুরু-পরম্পরায় কতকটা তার তিন-চার শ' বছরের ধাঁজটুকু এখনও পর্য্যন্ত অনেকটা বজায় রেখেছে এ অনুমান করা অসংগত হবে না), খ্রীষ্টীয় ৭ম বা ৩য় অথবা খ্রীষ্ট-পূর্ব ২য় বা ৩য় শতকের প্রাচীন ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে পুরা বোধ হওয়া অসম্ভব। 'সংগীতদর্পণ' প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত সংগীত-বিষয়ক বই থেকে, উত্তর-ভারতের ধ্রুপদ আর দক্ষিণ-ভারতের 'পদম্' আর 'কীর্তনম্'-এর মতো প্রাচীন বা প্রাচীন-গন্ধী সংগীত-রীতি থেকে, তার কতকটা অনুমান মাত্র ক'র্‌তে পারা যায় ; 'সংগীতদর্পণ' প্রভৃতি প্রাচীন বই (আমাদের বাঙলা দেশের আর নেপালের বৌদ্ধ পুঁথিতে আঁকা ছবি অজন্টার আভাস যেমন কতকটা দেয় সে-রকম ভাবে) বাণভট্ট-কালিদাস-শূদ্রকের যুগের সংগীতের একটা আভাস হয়তো দিতে পারে। কিন্তু সে-সব আলোচনা হ'চ্ছে সংগীতের ইতিহাস আর সংগীতের গতির বিষয়ে গবেষণার কথা।

ভারতে আর্য্যভাষার বিকাশ হ'য়েছে এই পথ ধ'রে—'সংস্কৃত' বা আদি-আর্য্য, 'প্রাকৃত' বা মধ্য আর্য্য, আর 'ভাষা' বা নব্য-আর্য্য। মধ্য আর নব্য-আর্যের সন্ধিক্ষণে আছে অপভ্রংশ, যা হ'চ্ছে একাধারে প্রাকৃতের অন্তিম রূপ, ভাষার আদিম রূপ। এই ভাষায় ইতিহাস আরম্ভ হ'য়েছে খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর দিক থেকে ; এখনও পর্য্যন্ত এই ভাষা-যুগ অর্থাৎ নব্য-আর্য্য যুগই চ'লেছে। এই নব্য-আর্য্য যুগের ভাষাতে আবার তিনটি স্তর ধরা হয়—আদ্য, মধ্য, নব্য। ভাষার ক্ষেত্রে, আদি-আর্য্য, মধ্য-আর্য্য, নব্য-আর্য্য—এসব স্তরের প্রচুর উপাদান বিদ্যমান ; কিন্তু সংগীতের

ক্ষেত্রে অনুরূপ নব্য-আর্য্য বা ভাষা যুগের মধ্য স্তরের (অথবা আদ্য স্তরের) পূর্বেকার উপাদান আমাদের সামনে আর বিদ্যমান নেই। আমীর খুস্‌রৌ আর গোপাল নায়ক—এঁরা ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের লোক; এঁদের সময় পর্যন্ত ধ্রুপদ-খেয়ালের সুর-লয়-যুক্ত গান রক্ষিত হ'য়েছে। এর পূর্বে আমরা জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদ পাচ্ছি, খ্রীষ্টীয় বারোর শতকে; গানের কথা পাচ্ছি, সুর-তালের নাম পাচ্ছি, কিন্তু সুরটি পাচ্ছি না—অন্ততঃ বাঙলাদেশে পাচ্ছি না; শুনেছি মহারাষ্ট্রদেশে নাকি পুরাতন সুর রক্ষিত আছে। সুর-তালের নাম দেখে, গানের ঢঙ্‌ দেখে মনে হয়, গীতগোবিন্দের সে সব গান ধ্রুপদের পর্য্যায়েরই ছিল। এর পূর্বে, খ্রীষ্টীয় বারোর শতকের প্রথম অর্ধে সংকলিত সংস্কৃত বিশ্বকোষ 'মানসোল্লাস' বা 'অভি-লষিতার্থ-চিন্তামণি-তেও গানের কথা পাচ্ছি; কিন্তু সুর-লয় জান্‌বার উপায় নেই। শিল্পী আর শিল্পের ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় রাজপুত রাগ-রাগিণী-চিত্রের আলোচনা-মূলক তাঁর বিরাট্‌ সচিত্র গ্রন্থের ভূমিকাতে আমাদের রাগ-রাগিণীগুলির ইতিহাস আলোচনা ক'রেছেন। আমাদের সংগীতে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর কল্পনা কত পুরোনো, তা ব'ল্‌তে পারা যায় না; তবে নাম থেকে অনুমান হয়, অন্ততঃ কতকগুলি প্রাচীন রাগ আর রাগিণী, বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত বা বিভিন্ন প্রদেশে উদ্ভূত জনপ্রিয় সুরের বা গতের আধারে তৈরী হ'য়েছিল; যেমন গুর্জরী বা গুজরী, মালব, বঙ্গালী, গৌড়, মালব-কৌশিক, বহ্বাড়ী, গন্ধার, ঝিঞ্ঝোটী, কানড়া। অর্থাৎ এ থেকে প্রমাণ হয়, আমাদের মধ্য-যুগে অর্থাৎ ১২০০-১৬০০-র মধ্যে যা Classical Music বা উচ্চাঙ্গের সংগীত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, তা মূলে, তার হাজার বছর আগে, বহুল পরিমাণে লোক-সংগীত-ই ছিল। মার্জিতরুচির লোকের হাতে, শিক্ষিত কলাবন্তর হাতে, লোক-সংগীত বা গ্রাম-গীত, উচ্চ অঙ্গের সংগীতে

উন্নীত হ'য়ে থাকে—সব দেশেই এটা দেখা যায়। পরবর্তী কালে সেই ধারাই চ'লে এসেছিল ব'লে মনে হয়; আমাদের প্রাচীন সংগীত কখনও স্থিতিশীল ছিল না, গতিশীল অর্থাৎ প্রাণবন্ত ছিল—আর সেইজন্যই এ জিনিস এতকাল ধ'রে জীয়ন্ত হ'য়ে চ'লে এসেছে। দরকার-মতো বিদেশী জিনিস এতে ঢুকেছে, লোক-গীতের বা গ্রাম-গীতের সুরও এতে বিস্তার ক'রেছে, এর সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়েছে। শুদ্ধ আর মিশ্রিত, প্রাচীন আর নবীন, দু'রকমেরই স্থিরীকৃত **melody** অর্থাৎ রাগের রেওয়াজ বোধ হয় গোড়া থেকেই আছে। আজ যা মিশ্র রাগ, **classical** বা প্রাচীন হ'য়ে কা'ল তা শুদ্ধ রাগের সম্মানই পেলে। তানসেনের সৃষ্টি 'দরবারী কানড়া' বা 'মিয়াঁ-কী মল্‌হার'—এই রকম রাগকে কেউ এখন আর **non-classical** অর্থাৎ নিকৃষ্ট, অথবা উৎকৃষ্ট বা উচ্চাঙ্গের নয়, এমন কথা ব'ল্‌বেন না।

খ্রীষ্টীয় বারোর-তোরোর শতকের পর, এদেশে তুর্কী-বিজয়ের পর থেকে, ফারসী মুসলমান ঈরানের সংস্কৃতি নোতুন ক'রে ভারতবর্ষের হিন্দু সংস্কৃতিকে প্রভাবান্বিত করে। ধর্মের আর আধ্যাত্মিক অনুভূতির ক্ষেত্রে ঈরান থেকে একটা প্রবল সূফী প্রভাব ভারতের নব-জাগরিত ভক্তি-বাদের উপরে প'ড়েছিল ব'লে মনে হয়। সূফী অনুভূতি আর দর্শন হ'চ্ছে মুখ্যতঃ শেমীয় আরব ইসলামের ধর্মভাব আর অনুভূতির প্রতি আর্য্য ঈরানের মনের প্রতিক্রিয়ার ফল, কিন্তু এর সংগঠনে ভারতের বেদান্তেরও যে একটা বড়ো স্থান ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। উত্তর-ভারতের বাস্তুশিল্পেও বেশ প্রচুর পরিমাণে ঈরানের প্রভাব পড়ে,—ভারতীয় বাস্তুশিল্পের প্রাথমিক উদ্ভবের যুগে, খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে হখামনিষীয় (**Achaemenian**) সাম্রাজ্যের পত্তনের সময় থেকেই, সাসানীয় (**Sassanian**) যুগ, আর তা ছাড়া ভারতের তুর্কী পাঠান আর মোগল রাজত্বের কালে—এই আড়াই হাজার বছর ধ'রে।

এই দুই বাস্তু-রীতির মিশ্রণে মধ্য-যুগের উত্তর-ভারতীয় বাস্তু-রীতিতে তার এক নোতুন **Indo-Moslem** বা ভারতীয়-মুসলমান ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাষাতে আর সাহিত্যেও (উত্তর-ভারতে বিশেষ ক'রে, যেখানে দোর্দণ্ডপ্রতাপ মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা ঘ'টেছিল) ঈরানী প্রভাব প'ড়্তে থাকে—বিভিন্ন উত্তর-ভারতীয় নব্য-আর্য্য ভাষায় ফারসী শব্দ এসে নিজেদের ঠাঁই ক'রে নিতে থাকে,—আর সতেরোর-আঠারোর শতকে দকনী অর্থাৎ দক্ষিণাপথে উত্তর-ভারতের মুসলমানদের দ্বারায় নীত আর প্রতিষ্ঠিত হিন্দী, আর উর্দু অর্থাৎ উত্তর-ভারতের মুসলমান রাজদরবারে প্রচলিত হিন্দী, এই দুটি ভারতীয় ভাষা, মুসলমান ঈরানের ফারসী ভাষা আর সাহিত্যের আদর্শ গ'ড়ে ওঠে। উত্তর-ভারতের সংগীতেও সেই রকম মুসলমান (অর্থাৎ ঈরানী) প্রভাব কিছু কম পড়ে নি। কিন্তু ঈরানের গজল-মর্সিয়া-কাওয়ালির সুর এসে গেলেও, আমাদের ভারতীয় সংগীতের জা'ত একেবারে যায় নি, আমাদের রাগ-রাগিণীর ঠাট ঠিকই বজায় ছিল, বাইরে থেকে যা এসেছিল তাকে একেবারে হজম ক'রে নিজের অঙ্গীভূত ক'রে নিয়েছিল। ভারতীয় সংগীতের বিকাশ তার পুরানো ধারা বজায় রেখেই চ'ল্‌ল। মুসলমান গায়কেরা আর সংগীতের মুসলমান পৃষ্ঠপোষকেরা সকলেই প্রাচীন যুগ থেকে উপলব্ধ রাগ-রাগিণীমূলক ভারতীয় সংগীতের রীতি বা পদ্ধতিকে গ্রহণ ক'র্‌লেন। দেশে ধ্রুপদ ছিল, আমীর খুস্‌রো ঈরানী প্রভাব এতে সংযুক্ত ক'র্‌লেন, তিনি আর তাঁর সমসাময়িক সংগীত-রসিকেরা নোতুন জিনিস আন্‌লেন—'খ্যাল' বা খেয়াল। পাঞ্জাবের প্রচলিত লোক-সংগীতের আধারে গ'ড়ে উঠ্‌ল 'টপ্পা', শোরী মিয়াঁর প্রভাবে যা উত্তর-ভারতের প্রৌঢ় বা শিক্ষিত সংগীতের সভায় একটি মর্য্যাদার আসন পেলে। তেমনি বুন্দেলখণ্ডের লোক-সংগীত থেকে 'দাদরা' এল। প্রাচীন কালে যে ভাবে প্রাদেশিক সংগীতের ক্ষেত্র থেকে প্রাণরস নিয়ে ভারতীয় বা

উচ্চকোটির সংগীত-তরু সমৃদ্ধ হ'য়েছিল, এ সেই জিনিসেরই পুনরাবৃত্তি হ'ল। মধ্যযুগে বাঙলাদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের হাতে 'কীর্তন'-এর সৃষ্টি হ'ল, ষোলোর আর সতেরোর শতকে ; এর মূলে ছিল প্রাচীন রাগ তার তাল। কিন্তু বাঙলার স্থানীয় লোক-সংগীতের প্রভাবে প'ড়ে কীর্তন একটা বিশিষ্ট রূপ ধ'রে নিলে। প্রাচীন ভারী আর বিলম্বিত চালের কীর্তন কখনও কখনও ধ্রুপদকেই স্মরণ করিয়ে দেয় ; কিন্তু হাল্‌কা চালের কীর্তনও এল। বাঙলাদেশের এদিক্‌কার কালে এই জিনিসের চল বেশি ক'রে হ'ল। বাঙলাদেশ উত্তর-ভারতের রাজধানী দিল্লীর তুর্কী পাঠান আর মোগল দরবার থেকে দূরে ছিল ব'লে, মধ্য-যুগে বাঙলার লোক-সংগীত উত্তর-ভারতের উচ্চ-কোটির সংগীতকে তেমন কিছু দিতে পারে নি—নিজের প্রকৃতি আর রুচি অনুযায়ী বাঙালাদেশের লোকেরা কীর্তন আর বাউল, ভাটিয়াল, রামপ্রসাদি প্রভৃতি কতকগুলি ঢঙের সুর নিয়েই খুশি ছিল ; আর পশ্চিমের সঙ্গে যোগ রাখ্‌তে পেরেছিলেন এমন শিক্ষিত সংগীতজ্ঞদের মধ্যে বাঙাদেশেও ধ্রুপদ খেয়াল একটা সম্মানের আসন ক'রে নিলে। পশ্চিম বাঙলায় বিষ্ণুপুর-নগর মল্ল-বংশীয় রাজাদের আমলে আঠারো শতকের গোড়া থেকে ধ্রুপদ-খেয়ালের একটি কেন্দ্র হ'য়ে পড়ে ; পূর্ব-বঙ্গে ঢাকাও সেই রকম পশ্চিম থেকে আগত কালোয়াতি গানের আর একটি কেন্দ্র হয়। লখ্‌নৌয়ের শৌখীন বাদশাহদের আমলে উত্তর-ভারতের সংগীতের গতি অব্যাহত থাকে, গজল কাওয়ালির আর টপ্পা-ঠুম্‌রির খুব-ই উন্নতি হয়। ধ্রুপদ-খেয়ালের পাশে-পাশে বাঙলাদেশেও টপ্পা-ঠুম্‌রির প্রচলন হয়, আর এই বিষয়ে রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু) উনিশ শতকের মধ্য-ভাগে বাঙালা সংগীতে তাঁর গান আর সুরের সাহায্যে যুগান্তর আনয়ন করেন।

দক্ষিণ-ভারতের কর্ণাটক-পদ্ধতির সংগীতের ইতিহাস আমরা ঠিক জানি না। বিগত শতকের মধ্য-ভাগে তেলুগু-ভাষী কবি

আর সংগীতকার, শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত ত্যাগরাজ, দক্ষিণের ধ্রুপদ 'কীর্তনম্' রচনা করেন; দক্ষিণ-ভারতের সংগীতে, উত্তর-ভারতের তানসেনের মতোই তাঁর গৌরবময় স্থান। ত্যাগরাজের তেলুগু কীর্তনম্‌গুলি রামচন্দ্র-বিষয়ক, উত্তর-ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সংগীতে তানসেনের ধ্রুপদের পদের মতন কর্ণাটকীয় সংগীতে এগুলির প্রসিদ্ধি—তামিল কানাড়ী আর মালয়ালী গায়কেরাও এই তেলুগু কীর্তনম্ গেয়ে থাকেন, যেমন মারাঠী, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী, গুজরাটী, বাঙালী গায়কেরাও তানসেনের ব্রজভাষা-হিন্দীতে নিবন্ধ ধ্রুপদ গেয়ে থাকেন। দক্ষিণ-ভারতের সংগীতে বোধ হয় আমাদের খেয়াল-টপ্পা-ঠুম্‌রির মতো প্রাচীনের নবীনতর রূপভেদ দেখা দেয় নি—মুসলমান-পূর্ব যুগের, শুদ্ধ হিন্দু-সংগীতের রূপটি বোধ হয় দক্ষিণ-ভারতেই বেশি ক'রে সংরক্ষিত হ'য়ে আছে।

বড়ো-বড়ো গায়কদের কথা ব'ল্‌ছি না, ভাতখাণ্ডে প্রমুখ প্রাচীন সংগীতের সংশোধক বা গবেষক এবং সংস্কারকদের কথা ব'ল্‌ছি না। আধুনিক বাঙলা গানকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষেরই সংগীতকে পুষ্ট ক'রে দিয়ে গিয়েছেন। এখন বিশেষ ক'রে বিগত দশ-পনেরো বছরের মধ্যে, রেডিও আর বেশি ক'রে সিনেমার কল্যাণে, নিখিল ভারতের সংগীত বিভিন্ন-প্রদেশ-নির্বিশেষে একই ছাঁচে ঢালা হ'য়ে যাচ্ছে। এক-ই হিন্দী গান বোম্বাই, পুনা, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, হাইদরাবাদ, মদুরা, নাগপুর, ক'লকাতা, ঢাকা, পাটনা, কাশী, প্রয়াগ, লখ্‌নৌ, দিল্লী, লাহোর, করাচী, অজমেরের রাস্তায় পথচল্‌তি লোকের মুখে শোনা যাচ্ছে—এই সব গান সিনেমার প্রভাবের ফল। প্যারসী থিয়েটারের মারফৎ বোম্বাইয়ের প্রচলিত সুর (প্রাচীন রাগ-রাগিণী ভেঙে, অথবা বিলিতি গান ভেঙে তৈরী) বাঙালাদেশে এসে যাচ্ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, আর হালে গুরুসদয় দত্ত, ইংরেজি সুরও বাঙলায়—ভারতবর্ষে—আমদানি ক'রেছেন। বাঙলা গানের সুর

ততটা ভারতের অন্যত্র স্থান পাচ্ছিল না ; এক তো এই-সব গানের ভাষা বাঙলা, বাঙলার বাইরের লোক বোঝে না—আর বাঙলা গানে (**classical** বা প্রাচীন গানের চেয়ে) কথার স্থানটি অনেক উঁচুতে ; তারপর, এই-সব গানের সুর, নিখিল-উত্তর-ভারত কর্তৃক সম্মানিত ভারিক্কে রাগ-রাগিণী নয়, ভাঙা রাগ-রাগিণীর। এই দুই কারণে, প্রচলিত বাংলা গানের সুর বাইরে ততটা যেতে পারে নি—কীর্তন বাউল ভাটিয়াল তো দূরের কথা। এগুলি খাঁটি বাঙালী **Folk-music** বা লোক-সংগীতের পর্য্যায়ের ব'লে, বাঙলার ভিতরে অনেকটা আর বাইরে, অপাংক্তেয় ছিল ; এক কীর্তন তো সেদিন-মাত্র দেশবন্ধু-চিত্তরঞ্জন, বিপিন-চন্দ্র পাল, রসময় মিত্র আর সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙলার শিক্ষিত সমাজে নিজের স্থান ক'রে নিয়েছে। নইলে, কীর্তন কেবল বৈষ্ণব সম্প্রদায়েই নিবদ্ধ ছিল ; বাউল ভাটিয়াল যে তার প্রাপ্য মর্য্যাদা পেয়েছে, তা মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে। বাঙালী ওস্তাদ বা কালোয়াতদের কাছে এগুলির মর্য্যাদা ছিল না, সেইজন্য বাঙলার বাইরেকার ওস্তাদ আর কালোয়াতদের শ্রদ্ধাও এই-সমস্ত বিশিষ্ট বাংলা সংগীত পেতে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদ-খেয়াল প্রভৃতি ভারতীয় শিল্পের প্রশস্ত রাজমার্গের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তিনি এগুলিকে উপেক্ষা করেন নি। প্রথম প্রথম শুদ্ধ বা প্রাচীন রাগ-রাগিণীর সংগীতের মোহে তিনিও প'ড়েছিলেন, এবং তাতে ফল ভালোই হয়েছিল। প্রথম জীবনে রচিত তাঁর অনেক গানের সুরে আমরা শুদ্ধ প্রাচীন সংগীতের পূর্ণ অনুকরণ দেখ্‌তে পাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়,—তাঁর সুপরিচিত ব্রহ্ম-সংগীতটি—

তোমারি মধুর রূপে ভ'রেছে ভুবন……।

এটি ঝিঞ্ঝোটী (বা ঝিঝিঁট) রাগের একটি বিখ্যাত ধ্রুপদ-চৌতালের ব্রজভাষা গানেরই সুরের পূরা অনুকরণ ; এই

প্রাচীন ব্রজভাষা বা হিন্দী গানটি এই ; কার রচনা এটি জানিনে*—

তেরো রী নয়ন বান, ভৌ হে ধনুখ, চৌন্দ্র-বদন-পর ঝলকত মোহত মন ॥
অরুন-বরন অধর, দৌন্ত কুন্দন বহার দেত ;
সোহৈ ঐসী বেনী সির-পর—নাগ কৌ ফন ॥
স্রবন কুণ্ডল, নাস বেসর, কৌণ্ঠ মাল ভুজ মিনাল, কুচু উতৌঙ্গ, নাভি ভ্রমর ; পহিরৈ নীল সাড়ী ॥
কটি কিঙ্কিনী, কদলী-খৌম্ভ জৌঙ্ঘ, চরম কনক-নুপুর ;
চলত চাল গতি মরাল, জোবন-ভরী ॥

কিন্তু নিছক ধ্রুপদের মৃদঙ্গ-নির্ঘোষ—কালোয়াতি সংগীতের, শুদ্ধ বা উচ্চ হ'লেও, এ-যুগের লোক আমাদের মধ্যে বেশির ভাগের কাছে, কতকটা আড়ষ্ট আর প্রাণহীন গীত—সকলকার প্রীতি-দায়ক হয় না ; সংগীতেও এমন সব জিনিস চাই, যা তার আশ-পাশের জীবনের পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্যুত বা পৃথগ্‌ভূত নয়। এই জন্যই, যেমন মধ্যযুগের হিন্দী বাঙলা ভেঙে আধুনিক হিন্দী বাঙলা, তেমনি মধ্যযুগের সংগীতের ধারা কালোয়াতি সংগীতের বিকাশে বা বিকারে জাত আধুনিক সংগীত রবীন্দ্রনাথকে সহজ ভাবেই টেনে নিলে। সংস্কৃত-চর্চার বারণ নেই, কিন্তু ভাষার চর্চাও চাই ; সংস্কৃত-চর্চা নিজেই একটা উদ্দেশ্য হ'তে পারে, কারণ তা একটি বড়ো দরের মানসিক বা আধ্যাত্মিক আনন্দের সাধন-স্বরূপ হ'য়ে থাকে ; কিন্তু সংস্কৃত-চর্চা বাঙলা ভাষার উন্নতির জন্যও হ'তে পারে। উচ্চ অঙ্গের সংগীত কতকটা

* শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বিষ্ণুপুর ঘরাণা' বইয়ে এই গানটিকে বাঙলার প্রখ্যাত ধ্রুপদী ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের রচিত ব'লে উল্লিখিত ক'রেছেন (কলকাতার প্রখ্যাত একটি পুস্তক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ প্রকাশিত, পৃঃ ৩৭)। বাঙলার ধ্রুপদী গাইয়েদের কেউ-কেউ যে ব্রজভাষাতে তাঁদের বাণী রচনা ক'রেছেন তার যথেষ্ট উদাহরণ আছে।

আধুনিক সংগীতেরই পটপভূমিকা-স্বরূপ বিদ্যমান, তাই তার চর্চা আবশ্যক—আধুনিক সংগীতের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখ্‌লে এ কথাটি বলা যায়।

অপূর্ব রসানুভূতির অধিকারী রবীন্দ্রনাথ যখন গান বাঁধ্‌তে আর সুর দিতে নিযুক্ত হ'লেন, তখন তাঁর সৃষ্ট বাঙলা গানের সুর একটা স্বতন্ত্র বস্তু হ'য়ে দাঁড়াল। তিনি গানে কথার যথোচিত মূল্য দিলেন। গানের বাণী বা কথা, আর গানের সুর, এই দুয়ের হাত ধরাধরি ক'রে না চ'ল্‌লে একটিকে না দেখে কেবল আরটির দিকেই দৃষ্টি দিলে, গান আর গান থাকে না, হ'য়ে দাঁড়ায়—হয় খালি কবিতা, নয় কেবল গৎ। বাক্য আর অর্থের মতো, কথা আর সুরের হর-গৌরী-মিলন হ'লেই সত্যকার 'গান' হয়। কবি নিজেই তাই গেয়েছেন—

প্রতিদিন তব গাথা গাবো আমি সুমধুর,
তুমি মোরে দাও কথা, তুমি মোরে দাও সুর॥

প্রাচীন 'বাগ্‌গেয়-কবি' অর্থাৎ সংগীত-রচকেরা একথা বুঝ্‌তেন ; সেই জন্যই জয়দেবের পদের এত যত্ন-সাধ্য লালিত্য ; তানসেন প্রমুখ ধ্রুপদ আর অন্য সংগীত রচকেরাও বুঝ্‌তেন—তানসেন, আমার মনে হয়, কেবল সংগীতকার ছিলেন না, বড়ো দরের কবিও ছিলেন, তা তাঁর রচিত বাণী বা কথা কেবল উপলব্ধি করা যায়। তানসেনের কাছেও তাঁর গানের কথা বা বাণী যথোচিত মর্য্যাদা পেয়েছিল। তাঁর রচিত একটি গানের শেষে তিনি বলেছেন—

তানসেন অন্তর-বানী ধুরুপদ পুকার॥

অর্থাৎ, তানসেনের অন্তরের বাণী এই ধ্রুপদ-গানেই উচ্চ রবে ঘোষিত হচ্ছে।

কিন্তু মাঝের যুগের ওস্তাদ বা কালোয়াত অর্থাৎ গায়ক, যাঁদের হাতে বেশি ক'রে সংগীত-শিক্ষা সমাজের তরফ থেকে দেওয়া হ'য়ে থাকে তাঁরা এ কথাটা প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁরা হ'য়ে পড়েন সংগীতের নিছক বৈয়াকরণ ; সংগীতের কথার মূল্য তাঁদের কাছে

বড়ো একটা ছিল না—যা তা শব্দ বা অক্ষর হ'লেই তাঁদের চল্‌ত। বাঙলার ওস্তাদের হাতে তানসেনের শুদ্ধ ব্রজভাষার মতো অমন সুন্দর আর মার্জিত একটা সাহিত্যের ভাষার কি 'হেনস্থা'ই না ইদানীং হ'য়েছিল! অজ্ঞাতার্থ হিন্দী শব্দের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, পশ্চিমা উচ্চারণে শুদ্ধ সংস্কৃত কথাগুলিরও অদ্ভুত সব বিকৃতি ঘ'টেছিল; 'সদ্যোজাত' হ'য়ে গিয়েছিল 'সাধ্বেও জাত', 'মোক্ষদায়িনী' (উচ্চারণে 'মোচ্ছ-দায়িনী') হ'য়ে গিয়েছিল 'মুচ্ছে দায়িনী', ; 'পক্ষিগণ', 'পাচিগণ'; 'অধ্যয়ন', 'আধোয়ান'; আর 'বীচ মেঁ' হ'য়ে গিয়েছিল 'বিছুমে'; 'উমড়-ঘুমড়' হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'উমডে গুমডে'; ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত গদ্যকাব্য 'কাদম্বরী'র সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ ক'রে সুন্দর আর বাঙলা-সাহিত্যে সুপরিচিত প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তাতে এ সম্বন্ধে তিনি ব'লেছেন—গানের কথায় আছে 'চলত রাজকুমারী', কিন্তু সুরের মোহে প'ড়ে গিয়েছেন ওস্তাদ গাইয়ে', তিনি ঘুরে ফিরে 'চ-ল-ত' শব্দটিকে নিয়েই সুরের পেঁচ ক'ষতে লেগে গিয়েছেন—এদিকে রাজ-কুমারীর চলা আর হয় না, কালোয়াতি সংগীতের সমঝদারদের তাতে আপত্তি নেই। গানের মধ্যে কথার মূল্যের প্রতি তিনি আবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'র্‌লেন। এ সম্পর্কে এ কথাও স্বীকার্য্য যে, বাঙলার কীর্তনে সুর আর বাজনার একটা বড়ো স্থান থাকলেও কথার উপরেই একটু বেশি জোর দেওয়া হ'ত—কীর্তনের মধ্যে আখর দেবার রীতি এর-ই ফল; এই জন্যও বোধ হয় ওস্তাদ-মহলে কীর্তন জা'তে উঠ্‌তে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব-সম্বন্ধে ভারতবর্ষে সুপরিচিত ওলন্দাজ-জাতীয় সংগীতবিৎ ও গবেষক শ্রীযুক্ত (অধুনা পরলোকগত) আর্নল্ড বাকে যা বলেছেন তা উদ্ধার ক'রে দেওয়া যায়—

Knowing the old *rāga*s perfectly well, he too had the right to use and change them as his own inspiration told him to do. Had not the old mystics created

their own *rāgas*, the *Bāüls* their own tunes, and had not *Kīrtan* adapted the old forms to new needs ?

His perfect balance of words and melody, and his simplicity and conciseness of construction, are contributions to the whole of Indian music that connot be under-rated easily.

It is characteristic of the genious of Rabindranath Tagore that he has as if by instinct, found the *Dhrūpad* the only form in ancient Indian music that could serve as a basis for his creations. From long before the Muhammadan conquest, even up to our present days, this form of Indian music, regarded as most sacred, continued to exist, in which the words had and have their importance. Still the holy character implied the use of very difficult tune and very dignified *rāgas*. The poet has succeeded in keeping the essential features of construction, but nevertheless has made the form supple and clear, fit for the direct appeal even to the heart of the simple peasant.

This happy combination of the *Dhrūpad* and folk-music is the strongest feature of the musical *œuvre* of Tagore. ('Rabindranath Togore's Music', in the *Golden Book of Tagore*).

কথা আর সুর পরস্পরের সঙ্গে এতটা অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত থাকার দরুনই রবীন্দ্রনাথের গানের এতটা জনপ্রিয়তা। তা ছাড়া, কথার নিজের বিশেষ কাব্য-সৌন্দর্য আর মর্যাদা বুঝে, তাকে তিনি তাঁর সংগীত-রচনায় যথোচিত স্থান দেন। বাঙলার বাউল

আর ভাটিয়াল, বাঙলার কীর্তন—Folk-lore অর্থাৎ 'লোক-যান' (অর্থাৎ কিনা আধুনিক শিক্ষা হ'তে দূরে থেকে, প্রাচীন মনোভাব নিয়ে যে-সব গ্রামীণ ব্যক্তি প্রাচীন সংস্কৃতির আবহাওয়ায় পরিবর্ধিত হ'য়ে চিরাচরিত রীতিতে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেন, তাঁদের চর্য্যা অর্থাৎ আচার এবং বিচার, সংগীতও এর অন্তর্গত) আলোচনা করেন এমন পণ্ডিত, অথবা গ্রামীণ প্রাচীন পদ্ধতির জীবনের প্রতি দরদী লোকেরা, হয়তো কালেভদ্রে যার চর্চা ক'রবেন, কিন্তু যা ক্রমে শিক্ষার আর আধুনিকতার প্রসারের সঙ্গে 'সেকেলে' আর 'গ্রাম্য' ব'লে লুপ্ত হ'য়ে যাবে—এরকম লোক-সংগীতের গণ্ডির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে আর নিবদ্ধ রইল না, বাঙালীর জাতীয় সংগীতের পর্য্যায়ে উন্নীত হ'ল ; শিক্ষিত বাঙালী-সমাজে স্থান পেয়ে, রবীন্দ্রনাথের গানে স্থান পেয়ে, বাংলার এই-সব লোক-সংগীত এখন নিখিল ভারতের নিকট গৃহীত হ'চ্ছে ; তাই আমরা হিন্দী আর অন্য ভাষায় সবাক্ চিত্রের গানে কীর্তন ভাটিয়ালি বাউলের ঝংকার মাঝে-মাঝে শুন্‌ছি। শ্রীযুক্ত বাকে এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ ক'রে লিখেছিলেন—It was the folk-music of Bengal that stirred the depth of his nature with such wonderful results. তিনি আরও মন্তব্য ক'রেছেন—Only the fact that the educated classes of his country who live in towns have lost contact with the real folk-life accounts for the discredit of his music in the appreciation of so many who love and admire his poems ;—এ কথাটা পুরোপুরি ঠিক না হ'লেও, আংশিক ভাবে ঠিক তো বটেই। পূর্ব-বঙ্গের বাউল আর ভাটিয়াল, আর পশ্চিম-বঙ্গের কীর্তন—এইতে মিলে তাঁকে সারা বাঙলার লোক-সংগীতের রাজা ক'রে তুলেছে।

রবীন্দ্র-সংগীতের আর একটি বড়ো জিনিস হ'চ্ছে, তাঁর দেওয়া

সুরের মধ্যে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যটুকু—the Rabindra touch. আমরা 'হিন্দুস্থানী দরদ'-এর কথা শুনি, হিন্দী গানে কোথাও কোথাও তা অনুভবও করি। দু-একটা এমন খোঁচ-খাঁচ, টান-টোন, গলায় কাঁপুনি গানের সুরের মধ্যে থাকে, তাতেই জিনিসটি একেবারে যেন কোন্ ঊর্ধ্বে উঠে যায়, তার সাধারণত্ব আর থাকে না। এই Rabindra touch—রবীন্দ্রের পুণ্যস্পর্শ, রবীন্দ্রের হাত, বা রবীন্দ্র-শ্রী—আমরা সকলেই বুঝি, রবীন্দ্র-সংগীতের ভালো গাইয়েরা এইটুকু-ই প্রকাশ ক'র্‌তে পারেন ব'লেই তাঁদের কদর। 'আমারে করো তোমার বীণা', 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী', 'আজি দখিন দুয়ার খোলা', 'অলি বার বার ফিরে যায়, অলি বার বার ফিরে আসে', 'এসো, এসো বসন্ত ধরাতলে', 'আমার নিশীথ-রাতের বাদল-ধারা', 'কার বাঁশী বাজিল', 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না', 'মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে'—ইত্যাদি ইত্যাদি কত গান মনে পড়ে, যা তরুণ অবস্থা থেকে শুনে আস্‌ছি, দরদী গায়কের মুখের ধ্বনি যে-সব গানের সুরের মধ্যে নিহিত এই অবর্ণনীয় রবীন্দ্র-শ্রীটুকু ফুটিয়ে তুলে, মনের মধ্যে একটি অব্যক্ত আকুলতা এনে দিয়েছে, এখনও এনে দেয়। গুরু-পরম্পরায়, আর রেকর্ডের সাহায্যে এই জিনিসটি রক্ষিত হ'তে পারবে। কালের স্থূল হস্তাবলেপের ফলে এই রবীন্দ্রীয় শ্রীটুকু হয়তো বা বিলুপ্ত হ'য়ে যেতে পারে ; কিন্তু তাহ'লে রবীন্দ্র-সংগীতের অনেকটাই চ'লে যাবে। আশা করি, এই জিনিসটুকু আধুনিক ভারতীয় সংগীতে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট দান ব'লে, এটুকুর রক্ষার জন্য সকলেই অবহিত হবেন। এটা একটা বিশেষ ঢঙ্ বা ভঙ্গী নয় ; এটি আরও সূক্ষ্ম, তুলির টানের মতন গলার বিশেষ রেশের ব্যাপার। আমার মতন অনভিজ্ঞ মানুষের কানে যেভাবে এই Rabindra touch-এর প্রকাশটুকু তার স্পর্শ এনে দিয়েছে, কেবল তারই বিষয়ে কিছু বল্‌বার জন্য এই অক্ষম চেষ্টামাত্র

ক'র্লুম—বিশেষজ্ঞরা আমার কথাগুলি ক্ষমা-ভাবের সঙ্গে গ্রহণ ক'র্বেন।

এই-সব, নিশ্চয়ই আরও অনেক-কিছু জড়িয়ে রবীন্দ্র-সংগীতকে ভারতের সংগীতের ইতিহাসে তার একটা নিজস্ব স্থান দিয়েছে। আমাদের দেশের বড়ো সংগীতকারদের সঙ্গে তুলনা কর্বার দরকার নেই; মহাকাল যথাসময়ে যার যে স্থান তা ঠিক ক'রে দেবেন; কিন্তু ভারত-সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে ভারত-সংগীতের আলোচনা ক'র্তে গেলে, আধুনিক কালে ভারতের সংগীত-বিষয়ক প্রচেষ্টার সম্বন্ধে কিছু ব'ল্তে হলেই, রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ না ক'রে পারা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংগীতে ইউরোপীয় সংগীতের **Harmony** অর্থাৎ বিবাদের মধ্যে সংবাদ আন্বার পক্ষেও ছিলেন। পথিকৃৎ বা সংস্কারক না হ'লেও, সংগীতের বাণী আর সুর উভয়েরই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন অসাধারণ রসস্রষ্টা।

রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় বাঙ্গালা ১৩৫০ সালে 'গীতবিতান বার্ষিকী'তে; পরে ১৩৭২ সালে, স্বল্প সংশোধন ও সংযোজন সহ, লেখকের প্রবন্ধ-সংকলন 'সাংস্কৃতিকী' দ্বিতীয় খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়।

Harmony

রবীন্দ্রনাথের "চিত্রলিপি"

এই বইখানি নানা দিক্ দিয়া একক, এবং বৈশিষ্ট্যময়। ইহাতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত আঠোরোখানি চিত্রের প্রতিলিপি আছে (এগুলির মধ্যে দশখানি বহুবর্ণময়), এবং চিত্রের ভাব ও উদ্দেশ্য লইয়া কবিবরের রচিত আঠারোটী ক্ষুদ্র বাঙ্গালা কবিতা এবং কবিতাগুলির ইংরেজী ভাবানুবাদ কবির স্বাক্ষরিত হস্ত-লিপির প্রতিলিপিতে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কবির রচিত একটি ইংরেজী ভূমিকা, ও শিল্পাধিষ্ঠাত্রী "চিত্রলেখা ত্রয়ী"র উদ্দেশ্যে রচিত আর একটি বাঙ্গালা কবিতা ও তাহার ইংরেজী অনুবাদও আছে।

এই বইয়ে সহজ-লভ্য আকারে কবির চিত্র-বিষয়ক কৃতির কতকগুলি নিদর্শন মিলবে। রবীন্দ্রনাথ সর্ববাদিসম্মতিক্রমে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে অন্যতম। সঙ্গীত বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব কাহারও কাহারও পক্ষে—বিশেষতঃ যাঁহারা ভারতের প্রাচীন সঙ্গীতের ব্যবসায়ী বা অনুরাগী তাঁহাদের কাহারও কাহারও পক্ষে—অনুমোদনীয় বলিয়া মনে না হইলেও, আধুনিক বাঙ্গালায় ও ভারতবর্ষে তিনি যে সঙ্গীতকে তাহার একটি অভিনব এবং বহুজনের মতো যুগোপযোগী রূপ দিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নাট্যেও—নাটক রচনায়, অভিনয়ে এবং প্রয়োগে—তাঁহার প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কলা বা সুকুমার শিল্প—ইংরেজীতে যাহাকে **Art** বা **Fine Art** বলে—তাহার চারিটি মুখ্য অঙ্গ ঃ কাব্য, সঙ্গীত, নাট্য এবং রূপ-শিল্প। রূপ-শিল্পের প্রকাশ হইয়া থাকে নেত্র-গ্রাহ্য রেখায়, বর্ণে এবং বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও ঘনত্বের সমাবেশের মধ্যে ; বাস্তুগঠন, ভাস্কর্য ও চিত্র উহার প্রকাশের তিন প্রধান উপায়। নাট্য—অভিনয় নৃত্য

চিত্রলিপি—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত ও রচিত। বিশ্বভারতী পুস্তকালয় কর্তৃক সেপ্টেম্বর ১৯৪০ সালে প্রকাশিত। আকার, ১১"×৯"। মূল্য ৪৷৷০ ; রাজসংস্করণ, কবি-কর্তৃক স্বাক্ষরিত, কুড়িখানি মাত্র, মূল্য দশ টাকা।

ইত্যাদিকে একাধারে চলমান চিত্র বা ভাস্কর্য এবং সঙ্গীতের সংযোগ বলা যাইতে পারে। এই চারি প্রকার কলার মধ্যে আপেক্ষিক স্থান কোনটির সর্বোচ্চে, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে রূপকর্ম, নাট্য, কাব্য এবং সঙ্গীত, এই তিনটির মধ্যে, সঙ্গীত-ই দ্যোতনা-শক্তিতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী—বিশেষতঃ যন্ত্র-সঙ্গীত, কারণ ইহা ভাষার অতীত, বাক্যের অতীত, এবং নেত্র-গ্রাহ্য রূপের অতীত। কিন্তু কাব্য, নাট্য ও রূপকর্ম বহুল পরিমাণে সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্র-নাথের মত অনুভূতিশীল কবি এবং নিষ্ঠাবান্ গুণীর কাব্য, নাট্য এবং সঙ্গীত, তিনটিই সার্থক-ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার অনুভবী প্রতিভা, রূপ-শিল্পের প্রতিও যে আকৃষ্ট হইবে, ইহা স্বাভাবিক। শিল্পকলার তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সমঝদার; অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীদের লোকোত্তর প্রতিভার একজন দরদী পরিপোষক তিনি, এবং বিদেশী শিল্পের মহত্ত্বও তিনি উপলব্ধি করেন। বহু বৎসর পূর্বে অস্‌লো নগরে নরওয়ের বিখ্যাত ভাস্কর গুস্তাভ্ ভিগেলাণ্ড-এর বিরাট্ ভাস্কর্য-বিষয়ক কৃতিত্ব দর্শন করিয়া তিনি বিশেষ-ভাবে তাহার সৌন্দর্য ও শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন; সেই দর্শনের অনুধ্যানের আনন্দে যাহাতে অন্তত একটি দিনের জন্য কোনও বাধা না পড়ে, সেই জন্য তিনি সারাদিন ধরিয়া অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া জন-সাধারণের মধ্যে দেখা দেন নাই, একথা নরওয়ের একটি বন্ধু আমায় বলিয়াছিলেন।

কলানুরাগী বিদগ্ধজন রূপ-শিল্পকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। কলা বা সঙ্গীতে কৃতিত্ব কিন্তু বিশেষ-শিক্ষা-সাপেক্ষ, শিক্ষা দ্বারা এবিষয়ে মানসিক প্রবণতাকে পুষ্ট এবং প্রকাশ-ক্ষম করিয়া তুলিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভা, শিক্ষা ও সাহচর্যের ফলে সঙ্গীতে সহজেই আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। রূপ-শিল্পে তাঁহার যে প্রকাশ কয়েক বৎসর হইল দেখা দিয়াছে, তাহার মধ্যে রূপকর্মের অনুধ্যান আছে, সাহচর্য

আছে, রূপকর্মের সহিত "সাহিত্য" আছে; কিন্তু রীতিমত পরিপাটী বা নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষা বা সাধনার সহায়তা রবীন্দ্রনাথের শিল্পময় প্রকাশের মধ্যে ঘটে নাই। রবীন্দ্রনাথের শিল্পচেষ্টার পক্ষে ইহাই সর্বপ্রধান লক্ষণীয় যে, ইহা স্বত-উৎসারিত, সাবলীল,—এবং ইহার মধ্যে অপরিহার্যতা-গুণ বিদ্যমান। কবির বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতির প্রকাশ যেমন আপনা হইতেই তাঁহার গানে, কাব্যে, নাটকে, কথায় হইয়া থাকে,—গোপন বার্তা যেমন তাঁহাকে প্রকট করিয়া দিতেই হইবে, তেমনি একটা অবশ্যম্ভাবিতার সহিত তাঁহার অনুভূতির প্রকাশ নূতন ভাবে রূপ-রেখায় ও বর্ণে আমাদের চোখের সামনে প্রকটিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অবশ্য শিক্ষার বা শিক্ষানবিশীর অভাব আছে—তাহা শিল্প-শিক্ষককে, এবং যিনি শিল্পের প্রাণ অপেক্ষা তাহার আকারকেই বড় বলিয়া মনে করেন তাঁহাকে, খুশী করিবে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই শিল্প-চেষ্টাকে শ্রীযুক্ত আনন্দ কুমারস্বামীর মত শিল্প-রসিক childlike, not childish—অর্থাৎ শিশুচেষ্টিতের মত সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত অতএব সুন্দর, বয়োবৃদ্ধ কর্তৃক শিশুর অসুন্দর অনুকরণ নহে, বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁহার রূপ-শিল্পের এই অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহার তুলিকার লিখনে যে ভাষাহীন গীতি বা উক্তি রচিত হইয়াছে, সাধারণ চিত্রের ভাষার ব্যাকরণ দিয়া তাহার যাচাই করিতে গেলে চলিবে না। কথা হইতেছে, এগুলির দ্বারা অনুভব-শীল ব্যক্তির চিত্তে কোনও ভাব-পরম্পরা উদিত হয় কি না। হয়তো রচনা-কালে যে ভাবের ভাবুক হইয়া কবি তুলিকার চালনা করিয়াছেন দ্রষ্টার মনে এই প্রকার চিত্রের দর্শনে ঠিক সেই ভাবটি জাগিবে না; কিন্তু তাহাতে আসিয়া যায় না—কারণ তথ্যের বাহিরেকার সমস্ত ব্যাপারেই আমাদের মন-গড়া ভাব-ই আমাদের পক্ষে কার্যকর হইয়া থাকে।

কবির আঁকা সব ছবিগুলিই যে শ্রেষ্ঠ বা সুন্দর তাহা কেহ

বলিবে না। ছবিগুলির মধ্যে সেগুলির উদ্ভবের ইতিহাস নিবদ্ধ রহিয়াছে। কেমন করিয়া বাঙ্গালায় ও ইংরেজীতে লেখা গান কবিতা বা গদ্যরচনার মধ্যে লিখন-কালে কোনও অংশ কাটাকুটি করিয়া বাদ দিবার আবশ্যকতা হওয়ায়, কবির অলস লেখনীর মুখে এই সমস্ত কাটাকুটির রেখা নানা প্রকারের নক্শার এবং কিম্ভূতকিমাকার জীবের রূপ গ্রহণ করিত। নিজ কল্পনার বল্গাকে শ্লথ করিয়া দেওয়ার ফলে, এই ভাবে কবির কলমের অব্যাহত গতির ফলে তাঁহার চিত্র-প্রতিভা নিজেকে দেখা দিতে আরম্ভ করে। কালো কালির লেখায় ক্রমে লাল কালির মিলন হইল, তাহার পরে বিভিন্ন রঙ্গের কালি আসিল, প্রথমটায় কলমের দ্বারায় ও পরে তুলির সাহায্যে তাঁহার চিত্র-রচনার ক্রম-বিকাশ চলিল।

কবির হাতে এইভাবে নানা ঢঙ্গের রঙ্গীন ও একরঙ্গা বহু চিত্র রচিত হইয়াছে। কতকগুলি নিছক্ কল্পনা-প্রসূত—নক্শা, অথবা আদিম যুগের বিরাট্কায় অদ্ভুত অদ্ভুত অধুনালুপ্ত জন্তুর অনুকরণে অঙ্কিত পশু পক্ষীর মূর্তি। বিভিন্ন রঙ্গের সমাবেশে রচিত প্রাকৃতিক দৃশ্য, ফুল-পাতা এবং অনেকটা স্বাভাবিক-ভাবে আঁকা নরনারীর চিত্রও তাঁহার হাতে দেখা দিয়াছে। এগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে একটা রোমাণ্টিক আব-হাওয়া বিশেষ স্পষ্ট।

শিল্পের দিক হইতে এই ছবিগুলির সার্থকতা অথবা, এগুলির নিরর্থকতা বিচার করিবার যোগ্যতা আমার নাই। তবে আমি এইটুকু বলিতে পারি, কবির আঁকা অনেকগুলি ছবিই আমার কাছে উপভোগ্য। রঙ্গের সমাবেশের দরুন, অনেকগুলির মূল্য আমার কাছে শব্দহীন গানের সুরের গুঞ্জনের মত মনে হয়। আমার কাছে কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগে, কবির হাতে আঁকা কতকগুলি মুখ। আমার মনে হয় এইখানে কবি মুখের আকার ও ভঙ্গীর দ্বারা অদ্ভুত-ভাবে ছবিতে মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া

তুলিয়াছেন। এখানে তাঁহার কৃতিত্ব একেবারেই শিশু-চেষ্টিতের মত নহে, এখানে যেন অকস্মাৎ প্রৌঢ় শিল্পের, ওস্তাদ শিল্পীর হাতের ঝঙ্কার দেখা দিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "চিত্রলিপি"র ২, ১১, ১৫ সংখ্যক চিত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কবির চিত্রের প্রদর্শনীতে এরূপ মুখের ছবি আরও অনেক দেখিয়াছি। কবির অসীমের আহ্বান তাঁহার কবিতা গান ও সুরে আমাদের শুনাইয়া দিয়াছেন, তেমনি মানব-চরিত্রের মধ্যে সীমার পরিচয়ও আমাদের দিয়াছেন; এই মুখচিত্রগুলি নূতন ভাবে, এবং নিরতিশয় শক্তি সহানুভূতি ও সার্থকতার সঙ্গে মানব-চরিত্রের সম্বন্ধে কবির সুগভীর আত্মীয়তাবোধের এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ দিতেছে। এই প্রকার মুখের ছবিগুলির জন্যই আমি রবীন্দ্রনাথকে উচ্চ-কোটির রূপ-শিল্পীর আসন দিতে ইতস্তত করিব না। হয় চিত্রগুলি, রেখা ও রঙ্গের **jeu d'esprit** বা প্রতিভার লীলা কিন্তু এগুলি যথার্থ **creative art**—প্রতিভার সার্থক শিল্প-রচনা।

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক ছবিটির আশয় অবলম্বন করিয়া, কতকটা ব্যাখ্যাত্মক ভাবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙ্গালা কবিতা ও সেগুলির ইংরেজী ভাবানুবাদ দিয়াছেন। সব সময়ে সেগুলি যে দ্রষ্টা এবং পাঠকের মনোভাবেরও প্রকাশক হইবে, তাহা মনে হয় না। কিন্তু তাহাতে ছবি ও কবিতা, উভয়ের মূল্য কমে না। একাধারে কবি ও চিত্রকার জগতে তাদৃশ সুলভ নহে। শিল্প-রসিক ব্যক্তি এই বই হইতে কবির প্রতিভার একটা নূতন দিক্ দেখিয়া প্রীতবিস্মিত হইবেন।

প্রবাসী, পৌষ ১৩৭৪

রবীন্দ্রনাথের দেশমর্য্যাদাবোধ

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এই বিষয়টি শোনা। এতে তাঁর দেশাত্মবোধ আর আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানের একটু পরিচয় পাওয়া যাবে।

রবীন্দ্রনাথ শেষবার যখন আমেরিকায় (অর্থাৎ আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্রে) যান, তখন তিনি সোজা কানাডা হ'য়ে গিয়েছিলেন। কানাডা থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি সোজা ভারতবর্ষ থেকে কানাডায় যান, তারপরে কিছুদিন কানাডায় ঘুরে সংযুক্ত-রাষ্ট্রের পশ্চিম খণ্ডে, দুটি দেশের সীমান্ত পার হ'য়ে, তাঁর ট্রেন কানাডা থেকে সংযুক্ত-রাষ্ট্রের একটি ছোটো সীমান্ত নগরে এসে পৌঁছল। এক দেশ থেকে আর এক দেশে ট্রেনে ক'রে যাত্রীরা আসছে ; যথা-রীতি পাসপোর্ট দেখার, আর বে-আইনীভাবে জিনিসপত্র এক রাষ্ট্র থেকে আর এক রাষ্ট্রে যাত্রীরা কেউ নিয়ে যাচ্ছে কিনা তার পরীক্ষা করার পালা এল। এই ব্যাপারটা বরাবরই বিরক্তিকর। আবার যে দেশে প্রবেশ করা যাচ্ছে, সেই দেশের রাজকর্মচারীরা ইচ্ছে ক'র্‌লে এটাকে আরও বিরক্তিকর এমন কি কষ্টদায়ক ক'রে তুল্‌তে পারে। মালপত্র পরীক্ষার অজুহাতে, গাড়ি থেকে বাক্‌স সুট্‌কেস্‌-ব্যাগ প্রভৃতি কুলি দিয়ে আর কুলি না পাওয়া গেলে নিজেদের ঘাড়ে ক'রে বইয়ে নিয়ে গিয়ে স্টেশনের মধ্যে একটা ঘরে জমা করায়, আর তারপরে সেখানে সব খুলে ঘাঁটাঘাটি ক'রে অস্থির ক'রে তোলে। যে জাতের লোকেদের উপরে রাগ, সে জাতের যাত্রী পেলে এই যন্ত্রণাটুকু এরা একটু বেশি ক'রে দিয়ে থাকে। এখন, আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চলে "হিন্দু" অর্থাৎ ভারতীয়দের উপরে স্থানীয় লোকেরা একটা বিজাতীয় ক্রোধ আর ঘৃণার ভাব পোষণ করে, কারণ ও অঞ্চলে বহু শিখ গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস ক'র্‌তে আরম্ভ করে, আর চাষবাস ক'রে শাক-সব্জী বিক্রির ব্যবসাটা, কাঠ চেরার কাজ প্রভৃতি কতকগুলি ব্যবসা আর কাজ প্রায় এক-চেটে করে নেয়। এই জন্য স্থানীয় শ্বেতকায় আমেরিকানরা আর অন্য নবাগত শ্বেতকায় উপনিবেশিকেরা ভারতবাসী শিখ বা

"হিন্দু"দের প্রতি ঈর্ষান্বিত হ'য়ে তাদের তাড়াতে চায়, নানারকম দুর্ব্যবহার ক'রে তাদের অতিষ্ঠ ক'রে তুল্‌তে আরম্ভ করে, আর শেষে আইন ক'রে তাদের দেশ-ছাড়া হ'তে বাধ্য করে। যখন রবীন্দ্রনাথের পাসপোর্ট দেখে তাঁকে "হিন্দু" অর্থাৎ ভারতবাসী ব'লে জান্‌তে পারে, তখন তাঁর মালপত্র সব নামিয়ে আনবার কথা পাসপোর্ট-পরীক্ষক ব'ল্‌লে, ওঁর প্রতি কোনও রকম ভদ্রতার ব্যবহার ক'র্‌লে না। কিন্তু তার উপরিওয়ালা একজন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" এই নামটা শুনে একটু ভদ্রতা-জ্ঞানের পরিচয় দিলে, —অত বড়ো বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির প্রতি সাধারণ যাত্রীদের, বিশেষ ক'রে সাধারণ ভারতীয় যাত্রীদের মতন ব্যবহার করাটা ঠিক হবে না, এ জ্ঞানটুকু তার ঘটে এল। সে তখন এসে ব'ল্‌লে—"দেখুন, যদিও আমরা "হিন্দু" যাত্রীদের একটু কড়া নজরে দেখে থাকি, আপনার বেলায় কিন্তু আমরা তা কর'বো না। আপনি "হিন্দু" হলে'ও একজন নামী লোক, তাই এই বিষয়ে খাতিরটুকু আমরা আপনার সম্বন্ধে ক'র্‌ছি—আপনার মালপত্র নামাতে হবে না।" এই কথা শুনে রবীন্দ্রনাথের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ক্রোধে আর ক্ষোভে যেন জ্ব'লে ওঠে। তিনি তাদের ব'ল্‌লেন—"না না, আমি নিজের ব্যক্তিগত পরিচয়ে তোমাদের কাছ থেকে কোনও বিশেষ খাতির বা ভদ্রতা চাই না; তোমরা আমার দেশবাসী জনসাধারণের সঙ্গে যে ব্যবহার ক'রে থাকো, ঠিক সেই ব্যবহার-ই আমার সঙ্গেও ক'রো—তোমাদের বিশেষ অনুগ্রহের প্রার্থী আমি নই।" তাঁর এই কথা শুনে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে এরা চ'লে গেল, আর তাঁর কামরার দিকে এল না।

এই ব্যাপারে আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্রে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের মনটা অত্যন্ত খারাপ হ'য়ে গেল। তারপর তিনি পশ্চিম আমেরিকার কালিফর্‌নিয়ার কোন্ একটা শহরে এলেন, বোধ হয় সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে, কিংবা লস্‌-আঞ্জেলিস্‌-এ। সেখানে তিনি আমেরিকার বহু প্রতিষ্ঠান থেকে নিমন্ত্রণ পেলেন,

তাদের মধ্যে গিয়ে তিনি বক্তৃতা দেবেন। তিনি প্রথমটায় স্থির ক'রেছিলেন যে এই সব নিমন্ত্রণের কতকগুলি অন্ততঃ গ্রহণ ক'র্‌বেন। এইভাবে তিনি আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্রে আর একবার ঘুরে যাবেন। তাঁর কার্য্যক্রম তদনুসারে তৈরী হবার কথা। কিন্তু ইতিমধ্যে স্থানীয় শিখ আর ভারতবাসীরা এল তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে। তারা তাঁকে জানালে—কি ভাবে তারা ছোটখাটো জমি নিয়ে ঘর বাড়ি থেকে শাক-সব্জীর চাষ ক'রে আর অন্য ব্যবসায় ক'রে চালাচ্ছিল, কিন্তু কেমন ক'রে শ্বেতকায় লোকেরা তাদের উপর চড়াও হয়, তাদের ব্যবসায় নষ্ট ক'রে সব অধিকার কেড়ে নেয়, নানারকম আইন ক'রে; তার ফলে অনেকে বেশ সংগতি সম্পন্ন অবস্থা থেকে একেবারে পথের ভিখিরি হ'য়ে পড়ে। তাদের আর উপায় নেই;—অনেক দিন ধ'রে অনেক পরিশ্রম ক'রে যা তারা গ'ড়ে তুলেছিল, তা নোতুন এক আইন, যার দ্বারা এশিয়ার লোকদের ওদের জমির মালিক হ'য়ে চাষবাস করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, সেই আইন ক'রে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এসব শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হন, আর এই অবিচার অত্যাচারের জন্য খুব ক্রোধও হয় তাঁর মনে। যারা তাঁর দেশবাসীর প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর অপমান অত্যাচার করে, তাদের দেশে আর থাক্‌তে তাঁর মন বসে না। হলিউড থেকে তাঁর খাস নিমন্ত্রণ এসেছিল, কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও এসেছিল। সব নিমন্ত্রণ আর সমস্ত প্রোগ্রাম নাকচ ক'রে দিয়ে তিনি দেশে ফিরে যেতে চাইলেন। যে কয়দিন না থাক্‌লে নয় সে কয়দিন মাত্র তিনি রইলেন এবং যাতে তাঁর সাথীরা তাঁর এই সংকল্প অনুসারে সব ব্যবস্থা ক'রে উঠ্‌তে না পারেন, সেজন্য তিনি নিজে জাপানী জাহাজ কোম্পানির অপিসে গিয়ে প্রথম যে জাহাজ আমেরিকা থেকে জাপানে যাবে তাতে ক'রে দেশের দিকে যাত্রার জন্য সেই জাহাজটির টিকিট ক'রে এলেন।

এই ঘটনা দুটিতে তাঁর স্বদেশের জনগণের প্রতি দরদ কতখানি ছিল, কতটা তিনি স্বদেশের মর্য্যাদার কথা ভাবতেন, তার একটু দিগ্‌দর্শন পাওয়া যাবে।

'পূর্ণিমা', শারদীয় সংকলন, ১৩৫৩ এবং পরে 'কালি ও কলম' ১৩৭৮ আশ্বিন সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ আজ বেঁচে থাক্‌লে ৮৮ বৎসর অতিক্রম ক'র্‌তেন। জর্জ বার্নার্ড শ ওদিকে ৯৩ বছর বয়সে পরিহাস-চটুল সতেজ চিন্তাধারার পরিচয় দিচ্ছেন। মানুষ শতায়ু হ'য়ে জীবন ধারণ ক'র্‌বে—এইটি-ই সাধারণভাবে আকাঙ্ক্ষিত, আর রবীন্দ্রনাথের মতো লোকোত্তর মানুষের পক্ষে সুস্থ সবল মন নিয়ে সকলের কাম্য দীর্ঘায়ু হ'য়ে বেঁচে থাকা জাতির পক্ষে সৌভাগ্যের কথা হ'ত। আমরা যাঁরা জীবনে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য আর তাঁর স্নেহ পেয়ে ধন্য হ'য়েছি—তাদের কাছে এটা একটা বিশেষ ক্ষোভের কথা যে রবীন্দ্রনাথ দেশের স্বাধীনতা দেখে যেতে পার্‌লেন না। হয়তো দেশের উপস্থিত অবস্থায় বেঁচে থাকা তাঁর পক্ষে কষ্টকর হ'ত, কিন্তু তাঁর উদার দৃষ্টি আর উপদেশ থেকে আমরা জাতীয় জীবনে কিছু-না-কিছু পথ্য আর পাথেয় সংগ্রহ ক'র্‌তে পারতুম। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ যে উক্তি ক'রে-ছিলেন তাঁর জীবৎকালে অনুষ্ঠিত শেষ জন্মদিনে, সেই উক্তির অন্তর্নিহিত সত্য আমরা মর্মে মর্মে অনুভব ক'র্‌ছি—That is he is still with us shows that God has not yet forsaken us.

রবীন্দ্রনাথের মতো বিরাট পুরুষের সম্বন্ধে কিছু ব'ল্‌তে গেলেই তিনটি বিষয়ের অবতারণা ক'র্‌তে হয়—(১) তিনি ব্যাপকভাবে আমাদের সমগ্র জাতির জন্য কী করেছেন বা কী দিয়ে গিয়েছেন, (২) তিনি সংকীর্ণভাবে তাঁর সমভাষাভাষীদের জন্য কী করেছেন—আর (৩) ব্যক্তিগতভাবে আমরা তাঁর কাছে কী জন্য ঋণী। শেষোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে বিচার বা আলোচনা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সূত্রে হ'তে পারে। কিন্তু আর দু'টি বৃহত্তর অপেক্ষাকৃত ব্যাপক দিক্ থেকে আমাদের যে বিচার হবে সেটা অনেকটা বস্তুতান্ত্রিক বিচার-ই হবে—একেবারে নিছক আত্মকেন্দ্রী নয়। প্রথমে আমরা সমগ্রভাবে ভারতীয় জাতির জন্য রবীন্দ্রনাথ কী দিয়ে গিয়েছেন সেটার একটু বিচার ক'রে দেখি—আর তা

থেকেই নিখিল ভারতের জনগণ রবীন্দ্রনাথের কাছে কতটা কৃতজ্ঞ থাক্‌বে তার একটা দিগ্‌দর্শন আমরা ক'র্‌তে পার্‌বো।

আর একটা কথা আছে। আমাদের ব্যক্তিগত, প্রদেশগত বা সমগ্র দেশ বা জাতি-গত সত্তার বা জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগের কথা অতিক্রম ক'রে বিশ্বমানবের সঙ্গে তাঁর যোগের কথাও বিচার্য্য। অবশ্য সে সম্বন্ধে স্পষ্ট অভিমত দেবেন—ভারতের বাইরের লোকেরা—আমাদের মুখে তাঁরা ঝাল খাবেন না। তবে তাঁরা কিভাবে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন ও দেখ্‌ছেন—তার ধারণা আমরা বিদেশে গিয়ে বা বিদেশীদের সঙ্গে মিশে বা বিদেশীদের লেখা প'ড়ে করতে পারি।

আমেরিকার সুপরিচিত লেখক Will Durant রবীন্দ্রনাথকে তাঁর লেখা একখানি বই পাঠিয়ে দেন—এই বইতে তিনি এইভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন—You are the reason why India should be free. একজন নিরপেক্ষ বিদেশীর কাছে এইরকম কথা শুনে বুঝ্‌তে পারা যায় যে, বাইরের লোকদের কাছে ভারতবর্ষের মর্য্যাদা—এই একটিমাত্র মানুষ কত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বাস্তবিক আমাদের সংস্কৃততে যে কথা আছে যে, সৎ পুত্রের দ্বারা 'কুলং পবিত্রং জননী চ কৃতার্থা' হ'য়ে থাকে, তা এই রকম ঘটনা বা অবস্থা থেকে বোঝা যায়। এখন থেকে ২৬/২৭ বছর পূর্বেকার কথা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ১০/১১ বৎসর পূর্বে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, কিন্তু ইউরোপের সব দেশেই তাঁর লোকপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান দেখে প্যারিসে ছাত্ররূপে আমাদের অবস্থানের সময়ে মহারাষ্ট্র দেশ থেকে আগত একজন সতীর্থ আমায় বলেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ is a greatest ambassador who can be sent out by any country to the world. —কথাটা অতি সত্য। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে সাধারণ ভারত-বাসীই বিদেশের সহৃদয় শিক্ষিত জনগণের কাছে যে মর্য্যাদা পেয়েছেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যে-সব জাতির লোক পৃথিবীতে

অগ্রণী—তাদের প্রাপ্য মর্য্যাদার চাইতে তা কোনও অংশে কম নয়। এটা ভারতের বাইরে নানা দেশে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। খালি মর্য্যাদা নয়—তার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের গৌরবের জন্য, তাঁর বিশ্বমানবিকতার জন্য আরও একটা জিনিস বিদেশীদের কাছ থেকে পেয়েছি—সেটা হচ্ছে হৃদ্যতা বা মিত্রতা, যেটা ইংলণ্ড আর আমেরিকার মতো দোর্দণ্ড-প্রতাপ জাতির মানুষও সর্বত্র সেভাবে পায় না। এই সব অভিজ্ঞতার কথা এর আগে ব'লেছি, এখন আর পুনরুক্তি ক'র্‌বো না। কাজেই আধুনিক ভারতবাসীর পক্ষে, বিশেষ ক'রে ইংরেজের অধীন ভারতবাসীর পক্ষে, রবীন্দ্র-নাথের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবার এই একটা মস্তবড়ো কারণ। রবীন্দ্র-নাথ বাইরের লোককে কোন কিছুর চটকে কোন কিছু sensational বা রোমাঞ্চকর ব্যাপার দেখিয়ে মুগ্ধ করেন নি—আর এইখানেই তাঁর গৌরব—আর ভারতেরও গৌরব। তিনি সহজভাবে নিতান্ত আপনার জনের মতো নানা জাতির বিদেশী লোকের মনে একটা ভালোবাসার আসন পেয়েছিলেন। একটি ছোটো ঘটনার কথা আমার মনে প'ড়্‌ছে—এটি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগের অভিজ্ঞতা। একবার প্যারিসে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল অবস্থান করেন। কালিদাসবাবু তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। প্যারিসের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে একটা বক্তৃতা দিতে রবীন্দ্রনাথকে যেতে হবে। লম্বা পাড়ি। ট্যাক্সি আনা হ'ল। রবীন্দ্রনাথের হোটেলের দরজায় ট্যাক্সি হাজির—উনি সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌ছেন। গাড়ি পর্য্যন্ত প্রত্যুদ্‌গমনের জন্য কতকগুলি লোক সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ সৌম্য আকৃতি আর সর্বোপরি তাঁর প্রশান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি আর ঋষি-জনোচিত মুখমণ্ডল, যা দেখে সকলেরই শ্রদ্ধা বা সম্ভ্রম জাগতো, ট্যাক্সিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলো—কালিদাসবাবু নেমে রবীন্দ্রনাথের জন্য ট্যাক্সির দরজা খুল্‌তে আস্‌ছেন, ট্যাক্সিচালক নিজে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো, এসেই চুপি চুপি তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলো—"মশাই, ইনি কে?" কালিদাস-

রবীন্দ্রনাথ

বাবু ব'ললেন, "ইনি হিন্দু বা ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ তাগোর"। শুনেই লোকটি সসম্ভ্রমে তাঁর দিকে তাকালো আর সঙ্গে সঙ্গে মাথার টুপি খুলে হাতে নিলে—আর নিজে এগিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথের জন্য গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইল। রবীন্দ্রনাথ গাড়িতে চ'ড়লেন—যথাস্থানে ট্যাক্সি এসে পেঁছিলো, সেখানে তাঁর জন্যে অপেক্ষমান লোকেরা—তাঁকে স্বাগত ক'রে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে, কালিদাসবাবু এলেন ট্যাক্সির মিটার দেখ্‌তে, ভাড়া কত দিতে হবে। বেশ একটা মোটা অংক উঠেছিল, কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালা কল ঘুরিয়ে দিলে আর ব'ল্‌লে, "আমি ভাড়া নেবো না—আমি ওঁর বই প'ড়েছি।" কালিদাসবাবুর কৌতূহল হ'ল—তিনি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "কী কী বই প'ড়েছ—আর কোন্‌ বইটা তোমার সব চাইতে ভালো লেগেছে?" "ফরাসীতে ৩/৪ খানা বই যা বেরিয়েছে, সব প'ড়েছি, তবে সবচেয়ে ভালো লেগেছে 'সাধনা'।" ব'লেই বেশি বাক্যব্যয় না ক'রে খালি ট্যাক্সি নিয়ে সে চ'লে গেল। এ থেকে এ কথা ব'ল্‌বো না যে, প্যারিসের প্রত্যেক বা বেশির ভাগ ট্যাক্সিওয়ালা রবীন্দ্রনাথের বই প'ড়ে থাকে। তবে একটা জিনিস বুঝ্‌তে পারা যায়, কী রকম ভাবে সাধারণ লোকের কাছে তাঁর বাণী পেঁছিছে—আর তাঁর কাছ থেকে তার কিছু অন্তত পেয়েছে মনে ক'রে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা—এমন কি ভালোবাসার ভাব পোষণ ক'রেছে। আর রবীন্দ্রনাথ কবি হিসাবে এই ভালোবাসাটুকুনই কামনা ক'রে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর প্রতি এই আকর্ষণ আর শ্রদ্ধার মূলে কোন রাজনৈতিক কারণ নেই, আছে এক সাধারণ মানবধর্ম যেটা সংকীর্ণ জাতীয়তা অথবা দলগত ভাবুকতা বা স্বার্থের বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত।

এইখানেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবের চিত্তজয়ের মূল কারণ নিহিত। তিনি মানুষকে ভালোবেসেছিলেন আর বিশ্বমানবের প্রতি প্রেম তাঁর জীবনে এ যুগে যে মহনীয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, সে রকমটি আর কোথাও দেখা যায় নি। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে কে

যেন ব'লেছেন, তিনি ছিলেন most stupendous mind of modern times—এটা যেমন সত্য কথা, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে এটাও সমানভাবে সত্যি কথা যে, তাঁকে "The greatest lover of man"এর দলে প্রথম শ্রেণীতে স্থান দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এত নানামুখী যে, তার বর্ণনা ক'রে অসংখ্য বিরুদ্ধ বা বর্ণনামূলক উপাধি তাঁর সম্বন্ধে তৈরি ক'রে প্রয়োগ ক'রতে পারা যায়, আর তা'তেও তাঁর গুণের পার আমরা পাবো না। উড়িষ্যার কবি সদানন্দ চৈতন্যদেবকে নাকি 'হরিনাম মূর্তি" এই আখ্যা দিয়েছিলেন—চৈতন্যদেবের নামধর্ম প্রচারের কথা মনে ক'রলে এই বিষয়টিকে তাঁর সম্বন্ধে সার্থক বলা যায়। তেমনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অন্যতম বিরুদ বা আখ্যা হ'তে পারে—'মানব-প্রেম-মূর্তি" বা 'মানবিকতা-বিগ্রহ'।

বিশ্বমানবের কাছে এই সম্মান আর বিশ্বমানবের মনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা—এই দু'টি জিনিস বহু স্থলে অঙ্গাঙ্গীভাবে গ্রথিত দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ যেমন ওদিকে বিশ্বজগতে আমাদের মর্য্যাদা বাড়িয়েছেন, তেমনি তিনি আমাদের ঘরের মানুষই রয়ে গিয়েছেন। এই দু'টি জিনিসের একত্র অবস্থান—বড়োই অপূর্ব, এক অদ্ভুত রহস্য। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যে ব'লেছেন, স্কাইলার্ক পাখি একদিকে গগনবিহারী, আকাশ আপনার সংগীতে সে ভরিয়ে দেয়—আর একদিকে সে মাটির উপরে তার বাসা ভোলে না। ওদিকে ফিনল্যাণ্ডের অনুরাগী ভক্ত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সংস্কৃতে কবিতা লিখ্‌ছেন—

> ন কর্হিচিৎ কিল প্রাচী প্রতীচ্যা সংগমিষ্যতি।
> পুরস্তাদ বৈ রবিস্ত্বুদয়ন্ প্রতীচীমপ্যরোচয়ৎ॥
> দক্ষিণামপ্যুদীচীং চ ব্যভাসয়দ্ উরুক্রমঃ।
> তৎ পূজ্যসে, রবীন্দ্র! ত্বম্ উত্তরস্যাং বিশেষতঃ॥

বাঙলায় যার অর্থ হচ্ছে—

'পূর্বদেশ পশ্চিমের সঙ্গে কখনো মিলিত হবে না, কিন্তু পূর্বদেশে

রবীন্দ্রনাথ

উদিত হ'য়ে রবি পশ্চিমকেও আলোকিত করেন—উরুক্রম অর্থাৎ বিষ্ণুর মতো দূরগামী হ'য়ে দক্ষিণ আর উত্তর দিককেও রবি উদ্ভাসিত ক'রেছেন ; সেইজন্য হে রবীন্দ্র ! তুমি বিশেষ ক'রে আমাদের উত্তরদেশেও পূজিত হও।'

আবার যবদ্বীপের ভাবুক রবীন্দ্রনাথের কবিতার তিন হাত ঘুরে-আসা অনুবাদ "বাঙলা থেকে ইংরিজি, ইংরিজি থেকে ডাচ, ডাচ থেকে যবদ্বীপীয় ভাষা" প'ড়ে ভাবাবেগে প্রকাশ্য সভায় কেঁদে ফেলেছিলেন—আর লেবাননের আরব কবি শান্তিনিকেতন এসে রবীন্দ্রনাথকে দর্শন ক'রে নিজেকে কৃতার্থ মনে ক'রে যাচ্ছেন, তেমনি এদিকে বাঙলা দেশের মেয়েরা সভা ক'রে রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান ক'রে এনে তাঁকে জানাচ্ছেন—আপনি আমাদের ঘরের কবি, আমাদের গৃহকর্মের ভিতরে, আমাদের রান্নাঘরের ভিতরেও আপনাকে পেয়েছি। কথাটা যে বলা হ'য়েছে—অতি সার্থক কথা—"He alone is truly international who is most intensely national''. সেক্সপীয়র সম্বন্ধেও বলা হ'য়েছে যে, এক দিকে যেমন ইংলণ্ডের জাতীয় কবি, তেমনি তিনি সমগ্র জগতের কবি।

আধুনিক কালের ভারতীয় চিন্তানেতাদের কারো কারো বাণী বা শিক্ষা বা চরিতকথা ভারতের বাইরে মানুষদের মধ্যে পৌঁছেছে। কিন্তু এঁদের সকলের সব কথা কিংবা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য যে বাইরের লোক ঠিকমতো ধ'রতে পেরেছে, তা মনে হয় না, আর ধ'রতে পারাও সম্ভব নয়। স্বামী বিবেকানন্দের মহিমা কিছু কিছু তাঁর বাইরের শিষ্যেরা তাঁর সঙ্গে এসে বা তাঁর লেখা প'ড়ে বুঝতে পেরেছিলেন, ভগিনী নিবেদিতার মতো দু'চারজন, তিনি যেভাবে বেদান্তকে আধুনিক জীবনে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তারও ধারণা ক'রতে পেরেছেন, কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত অ-ভারতীয়ের কাছে ভারতীয় সভ্যতারই মতো দুর্বোধ্য প্রহেলিকা হ'য়ে থাকতেন, যদি না রোমা রেঁলার মতো অনুভবী ও দরদী চিন্তানেতা তাঁর স্বরূপ পাশ্চাত্ত্যের সামনে

সার্থকভাবে প্রকাশ ক'রে দিতে সমর্থ হ'তেন। গান্ধীজীর অহিংসা আর সত্যাগ্রহ, তাঁর আদর্শ আর কার্যক্রম ইউরোপে আমেরিকায় সাধারণ লোক তো বুঝ্‌তেই পারে না, অ-সাধারণ লোকের মাথাতেও ঢোকে না, কিন্তু তিনি যে ইংরেজকে বিব্রত ক'রেছিলেন, এটা তারা বুঝেছিল। আর ইংরেজদের প্রতি প্রীতির আধিক্য আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের যোগী ফকির সন্ন্যাসীদের বিভূতি সম্বন্ধে একটা আব্‌ছা আব্‌ছা ভীতিমিশ্র বিস্ময়ের ভাব—এই দুইয়ে জনসাধারণের মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা এনেছিল—যদিও একথা স্বীকার ক'র্‌তে হবে যে, সত্যকার উচ্চ মনোভাবের মনীষীদের অনেকে মহাত্মাজীর অহিংসার বাণীর আবশ্যকতা বেশ প্রণিধান ক'রেই মেনে নিয়েছিলেন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বধে আলাদা কথা। তাঁকে লোকে পেয়েছিল কবি-রূপে। যাঁর লেখায় তারা তাদের মনের মধ্যে নিহিত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, নীতি-আদর্শ প্রভৃতির প্রতিধ্বনি পেয়েছিল—One touch of nature maketh the whole world keen. এই touch of Nature রবীন্দ্রনাথকে সকল দেশের মানুষের আত্মীয় ক'রে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথ সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের আর ভারতবাসীদের মর্যাদা বাড়িয়েছেন—কিন্তু তাঁর সমভাষাভাষী আমরা বাঙালী—আমাদের জন্য বিশেষভাবে, তিনি যা দিয়ে গিয়েছেন—তার মূল্য আমরা ঠিকমতো হয়তো বুঝি না, আর মূল্য দিতেও হয়তো আমরা পার্‌বো না। রোদ, হাওয়া, জলের মতো, এমন অনেক জিনিস আছে, আমাদের ভাব-জগতে আর সামাজিক জীবনে যা না হ'লে আমাদের একদণ্ড চলে না—আর যার কথা আমরা সাধারণতঃ মনে রাখি না। আমাদের এই যে বাঙলা ভাষা, যেটা উপস্থিতকালে বাঙালীর প্রতিষ্ঠার একটি প্রধান অবলম্বন ব'লে আমরা মেনে নিয়েছি, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে সেই বাঙলা ভাষায় গর্ব করার আর যা থাকে, তা কতটা বিশ্বসাহিত্যের কোঠায়

রবীন্দ্রনাথ

পেঁছে (আমাদের বাঙলার আর ভারতের জীবনে তার সার্থকতা যা-ই থাক্ না কেন), সেটা বিবেচনা কর্বার বিষয়। ইংরেজ সাহিত্যিক গোল্ডস্মিথ সম্বন্ধে অতি উচ্চপ্রশংসা ক'রে ডাঃ জনসন যে-কথা ব'লেছিলেন, সে-কথা রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—"He touched nothing which he did not adorn." রবীন্দ্রনাথের মতো এমন সার্বভৌম সাহিত্যসম্রাট্ জগতের বাঙ্ময় ইতিহাসে আর কোথায় দেখা গিয়েছে ? এ সম্বন্ধে মাতৃভাষার সাহিত্যের সঙ্গে স্বল্প পরিচয়ও যার আছে—এমন বাঙালীকে কিছু বল্বার আবশ্যকতা নেই। সোফোক্লেস্ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি 'Saw life steadily and saw it whole', রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সে-কথা তো ব'ল্তে পারা যায়-ই, উপরন্তু তিনি কেবল জীবন-নাট্যের **spectator** বা দর্শক মাত্র ছিলেন না। তাঁর মধ্যে zest of life, জীবন-রস সম্বন্ধে সচেতনতা আর আগ্রহ এত ছিল যে, তিনি নিজে তা'তে পুরোপুরি অংশ নিতে দ্বিধা করেন নি। এই জন্যে সাহিত্যের বাইরে অথচ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহিত্যের সঙ্গে সংযুক্ত সংগীত, অভিনয় সজ্জা, রূপকলা প্রভৃতি তাবৎ সুকুমার শিল্প তাঁর এলাকর অধীনেই ছিল। আবার ওদিকে রাষ্ট্রজীবনের সঙ্গেও তাঁর সংযোগ যে কত ঘনিষ্ঠ ছিল, সেকথা আধুনিক ইতিহাসের অনেক পৃষ্ঠা জুড়ে আছে। বাঙালীকে পরিপূর্ণ ভারতীয় আর পরিপূর্ণ মানুষ হ'তে রবীন্দ্রনাথের দান যে কতখানি, তা অল্প কথায় বুঝিয়ে বল্বার নয়। ভগবানের আশীর্বাদ-স্বরূপ এ যুগে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব না হ'লে মানবিক সংস্কৃতিতে, আত্মসম্মানে, জাতীয়তার প্রতিষ্ঠায় বাঙালী কতটুকু দাঁড়িয়ে থাক্তে পার্তো সে বিষয়ে আমরা প্রশ্ন ক'র্তে পারি। তিন রকম ঋণ নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে জন্মায়, দেব-ঋণ, পিতৃ-ঋণ আর ঋষি-ঋণ। মানুষেব জীবন আর জীবনের সাধনা এই তিন ঋণের পরিশোধ-চেষ্টাতেই হ'য়ে থাকে। রবীন্দ্র-নাথের লেখার সঙ্গে পরিচয় সংস্থাপন এবং দেশবাসীর মধ্যে তাঁর

বাণীর প্রচার আমাদের জীবনের অন্যতম ঋষি-ঋণ পরিশোধ ব'লে আমরা ধর্‌তে পারি। এইজন্যই প্রত্যেক সহৃদয় মানসিক-সংস্কৃতি-কামী বাঙালীর এদিকে একটা কর্তব্য আর দায়িত্ব আছে। রবীন্দ্রনাথের বাণী ইংরিজি মারফৎ প্রধানত ভারতের অন্য প্রদেশে পৌঁছেছে, সম্প্রতি নাগরী অক্ষরে রবীন্দ্রনাথের মূল বাঙলা রচনা প্রকাশনের যে প্রস্তাব বিশ্বভারতী কার্য্যে পরিণত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন, সেটি একটি বিশেষ সময়োপযোগী কাজ হবে—এর দ্বারা রবীন্দ্রনাথের আর সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের আদর নিখিল ভারতে আরও বাড়্‌বে, এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। এই কাজে রবীন্দ্র-ভারতীরও অংশ গ্রহণ করা কর্তব্য ব'লে মনে করি।

এখন বিশ্বমানব, ভারতবর্ষ আর বাঙালী সমাজের কথা ছেড়ে নিজের ব্যক্তিগত কথায় বলতে পারা যায়, আমার নিজের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণে রবীন্দ্রনাথ যতটা স্থান নিয়ে আছেন, তার-ই পটভূমিকার সামনে ব্যাপকতর পরিধির মধ্যে তাঁর প্রভাবের কথা আমি বিচার করতে পারি। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত কথা সব বলবার নয়, ব'ল্‌তে পারাও যায় না, তবে আমার জীবনে সে সমস্ত বস্তু আমাকে আমার মানসিক আর আধ্যাত্মিক সার্থকতার পথে পরিচালিত ক'রেছে, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য আর তাঁর ভাবধারার সঙ্গে স্বল্পাদপি স্বল্প পরিচয় একটি প্রধান। স্কুলে পড়্‌বার সময় ১৪ বৎসর বয়সে রবীন্দ্র-রচনার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে—'চিত্রা'র আর 'কথা ও কাহিনী'র কতকগুলি কবিতার মাধ্যমে তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার একটি ঝলক চোখের সামনে আসে—অনির্বচনীয় এক সৌন্দর্য্যময় স্বপ্নরাজ্যের দ্বার যেন আমার জন্যে উন্মুক্ত হ'য়ে যায়। যার পাত্র যতটুকু, সে ততটুকু-ই নিতে পারে—আমার মতো সাহিত্যিক-রসবোধ-বর্জিত নীরস ভাষাতত্ত্বের আলোচকের মত যতটা আপ্লুত হবার তা হ'য়েছে, জীবনে এক নোতুন অমৃত রসের আস্বাদ রবীন্দ্র-রচনা আমার কাছে এনে দিয়েছে। ভাষাতত্ত্বের আলোচক হিসাবে আমার পক্ষে একটা

রবীন্দ্রনাথ

বিশেষ আত্মপ্রসাদের কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের একটা দিক আমাদেরই পর্য্যায়ে পড়ে—ব্যাকরণিয়া রবীন্দ্রনাথকে আমাদের আলোচ্য বিদ্যার একজন পথিকৃৎ ব'লে আমরা মেনে নিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য্য, সেটা জীবনে এক অপূর্ব সৌভাগ্য রূপে আমি পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে কথা কওয়াটাই ছিল এক শ্রেষ্ঠ মানসিক রসায়ন। তাঁর স্নেহ পেয়েও ধন্য হ'য়েছি। তাঁর স্নেহ আমার মতো অনেকেই পেয়েছেন, কিন্তু মহাপুরুষদের সঙ্গে যাঁদের সংযোগ বা সাহচর্য্য ঘটে, তাঁদের প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্যের আধারের মধ্যে এই সংযোগের সূত্র মিলবে। তানসেন তাঁর এক ধ্রুপদের বাণীতে তাঁর আরাধ্য দেবতার সম্বন্ধে ব'লেছেন যে, তুমি বহুবল্লভ কিন্তু তানসেনের কাছে তুমি একবল্লভ। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের মধ্যে আমি এমন একটা দিক পেয়েছি, যেখানে কেবল তিনি আছেন আর আমি আছি—আর কারো স্থান সেখানে নেই। একথা আমার মতো আরও অনেকে নিশ্চয়ই ব'ল্‌তে পারবেন। মহাপুরুষের সর্বন্ধরত্বের এই একটা প্রমাণ। ব্যক্তিগত কথা এসে প'ড়্‌লে মূক হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। আর এই কথা ব'লেই আমি আমার বক্তব্যের উপসংহার ক'র্‌ছি—**The highest tribute is tribute of Silence.'**

সাপ্তাহিক দেশ, বঙ্গাব্দ ১৩৫৬।

ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ছিল নানামুখী, তাঁহার প্রতিভা ও কর্ম উভয়-ই নানা ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ভাবপ্রবণতা ও জ্ঞাননিষ্ঠা, জাতীয়তা ও বিশ্বমানবিকতা, শান্তি ও সংগ্রাম প্রভৃতি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী ধর্ম ও কর্ম তাঁহার চিত্তে ও চরিত্রে অপূর্ব সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছিল। সুদক্ষ মণিকারের হাতেকাটা ভাস্বর হীরকখণ্ডের ন্যায় তাঁহার ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্য দেখা দিয়াছিল নানা ভূমিতে, যে দিক্ হইতেই ইচ্ছা দেখা যাউক না কেন ইহার দীপ্তি ও বর্ণবৈচিত্র্য দর্শককে মুগ্ধ করিবে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ঔপন্যাসিক, তিনি ছিলেন নাট্যকার এবং নাট্যকলার প্রযোজক ; তিনি সংগীত ও সুরের শিল্পী ছিলেন, কলাবিৎ এবং কৃতকর্মা রূপকার-ও ছিলেন ; আধ্যাত্মিক অনুভূতির আভাস তাঁহার কাব্যরচনায় সুপরিস্ফুট, এবং সঙ্গে-সঙ্গে বাস্তব জীবনে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাশীল কর্মপ্রচেষ্টা, সামাজিক ও মানসিক জগতে সুধার ও সংস্কার তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। রসানুভূতিময় অন্তর্দৃষ্টি এবং বৈজ্ঞানিক অবলোকন ও বিচার-শক্তি, এই উভয়ের এরূপ অদ্ভুত সমাবেশ মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে নিতান্ত বিরল ; এই দিক্ দিয়া দেখিলে চিন্তানেতা ও সত্যদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে প্লাতোন্, আরিস্তোতল, পতঞ্জলি, লেওনার্দো দা-ভিঞ্চি ও গ্যোতে প্রমুখ মহামানবদের সঙ্গে সমশ্রেণীর বলিতে হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীকে পৃথিবীর দশ-বারোটি প্রধান বা শ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ বা গ্রন্থাবলী অথবা মহাকবি-বিশেষের রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম বলিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের, সাহিত্যিক ও অন্য নানাবিধ প্রকাশের গভীর ও ব্যাপক আলোচনা বহু রসজ্ঞ এবং দর্শনশীল সমালোচক বহুদিন ধরিয়া করিবেন ; রবীন্দ্রনাথ নিজ কৃতি-স্বরূপ একটি বিরাট্ সাহিত্য-রত্নভাণ্ডার চিরন্তন কালের জন্য আমাদের দিয়া গিয়াছেন, এবং সেই সাহিত্য ও তাঁহার জীবনের বিচিত্র কার্য্যা-বলীকে অবলম্বন করিয়া ক্রম-প্রবর্ধমান “রবীন্দ্রসাহিত্য”, বাঙ্গালা

ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় ইতিমধ্যে যাহার পত্তন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, তাহা গঠিত হইতে থাকিবে।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত মহত্ত্ব তাঁহার জাতিকে ধন্য করিয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে সত্যই বলা যায়—'কুলং পবিত্রং জননী চ কৃতার্থা'। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব-গৌরবে তাঁহার মাতৃভূমি ভারতবর্ষে বিশ্ব-মানব-সভায় কী পরিমাণে উন্নীত ও গৌরবান্বিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যাঁহারা ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশে এ বিষয়ে একটু অভিজ্ঞতা অর্জন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারাই জানেন, রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়িয়া ভারতের সংস্কৃতির প্রতি এবং সঙ্গে-সঙ্গে ভারতবাসীর প্রতি পৃথিবীর নানা দেশের লোকেদের মনে কতটা গভীর শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি জাগিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ছিল আমাদের সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে এক অমূল্য সম্পৎ। এই সম্পদের সম্বন্ধে বহু বিদেশী সহৃদয় ব্যক্তি সচেতন ছিলেন—আমাদের সকলে হয়তো ইহার মূল্য ততটা বুঝি না বা বুঝিতাম না। আমেরিকার একজন বিখ্যাত লেখক উইল্ ড্যুরাণ্ট্ রবীন্দ্রনাথকে স্বরচিত একখানি বই একবার পাঠাইয়া দেন, সেই বইয়ের ভিতরে তিনি স্বহস্তে রবীন্দ্রনাথের নামে সমর্পণ লিখিয়া দেন—**You are the reason why India should be free,** অর্থাৎ 'তুমি যে আছ, ইহা-ই ভারতের পক্ষে স্বাধীন হইবার জন্য প্রধান কারণ বা দাবী।' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৯২৭ সালে মালয়-উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ ও শ্যাম-দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিবার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। সেই সময়ে বলিদ্বীপের প্রধান ডচ্ রাজপুরুষ শ্রীযুক্ত কারন্ আমায় বলিয়াছিলেন, 'আপনারা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আছেন; দেখিবেন, উহার স্বাস্থ্যের কোনও হানি যেন না হয়; আপনাদের দায়িত্ব বিশেষ গুরুভার, কারণ রবীন্দ্রনাথ কেবল আপনাদের দেশের নহে, উনি সমগ্র মানবজাতির।' আমার একজন মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু ফ্রান্সে অবস্থান-কালে আমায় বলিয়াছিলেন,—**He has been the**

greatest ambassador any country could have—he has been the greatest ambassador of India whose services have rendered her high and great among nations, অর্থাৎ 'রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড়ো রাজদূত পৃথিবীর কোনও দেশের ভাগ্যে ঘটে না ; ভারতবর্ষের পক্ষে এঁর চেয়ে রাজদূত আর কখনও হয় নি, এঁর উপস্থিতিতে আর কার্যে বিশ্বের তাবৎ জাতির মধ্যে ভারতের স্থান উঁচুতে উঠেছে আর মহৎ হয়েছে।' এই কথাটি অতি খাঁটি কথা। ইংলান্ড বা আমেরিকার শক্তি আর ঐশ্বর্যের কারণেই ইংরেজ বা মার্কিন জাতির লোক যেখানে বিশ্ব-জনসভায় খাতির পায়, সেখানে বিজিত, পরাধীন, নিজ বাসভূমেও পরবাসী ভারতবাসী সম্মানের আসন পাইয়াছে,—ইহা বহুবার দেখা গিয়াছে ; সম্মান পাইয়াছে জনসাধারণের নিকটে—রাজনৈতিক দরবারে হয়তো ভারতের স্থান নাই, কিন্তু ভারতবাসী পাইয়াছে জনগণের হৃদয় হইতে স্বত-উৎসারিত প্রীতি ও সম্মাননা। কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য, উপন্যাস এবং জ্ঞান ও চিন্তা-গর্ভ প্রবন্ধের মধ্য দিয়া, তাঁহার গীতি-কবিতায় এবং নাটকের মানবিকতা ও তাঁহার আনুষঙ্গিক রহস্য-বোধের অপূর্ব সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া-ওশেনিয়া এই পাঁচটি মহাদেশের বিভিন্ন জাতির মানবের মনের মধ্যে নিজের আসন করিয়া লইয়াছেন ; ভারতের সনাতন আকাঙ্ক্ষা তাঁহার লেখায় মূর্তি পাইয়াছে এবং তাহার মধ্যে বিশ্বমানব-ও তাঁহার নিজের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে দেখিতে পাইয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতি, তাঁহার ভারতীয় সাধনার আদর্শের প্রতি, তাঁহার জাতির প্রতি, নানা দেশের মানুষের এতখানি দরদ।

আমি নিজের জীবনে বিদেশ-ভ্রমণকালে ছোটো বড়ো নানা অভিজ্ঞতা হইতে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছি—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সমজাতিত্ব আছে বলিয়া, রবীন্দ্রনাথের দেশেরই মানুষ

আমি সেইজন্য, আমার কদর কতটা বাড়িয়া গিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই শ্রদ্ধার ভাব জগতে বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। ১৯২২ সালে ছাত্রাবস্থায় যেমনটি দেখিয়াছিলাম, ১৯৩৮ সালেও সেই ভাব-ই দেখিয়াছি, এখনও সব দেশে লোকে তাঁহার বই পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, আধ্যাত্মিক ও মানসিক আনন্দ, শক্তি ও শান্তি পায়; তিনি কেবল হুজুগের বা ফ্যাশনের ঢেউয়ের মাথায় দুই দিনের বা দুই বছরের জন্য ইউরোপের আমেরিকার চীন জাপানের চিত্ত জয় করিয়া পরে চির-বিদায় লন নাই; এখনও তাঁহাকে লোকে মনের নিভৃত কোণে শ্রদ্ধার সিংহাসনে বসাইয়া রাখিয়াছে; তাঁহাকে না পাইয়া, ব্যক্তিগত-ভাবে তাঁহার সান্নিধ্যে আসিতে না পারিয়া, তাঁহার দেশবাসীকে পাইয়া তাঁহার প্রতি সেই শ্রদ্ধার নিবেদন যেন ঐ নগণ্য দেশবাসীর মারফৎ-ই করিতে চাহিতেছে। আমি ১৯২২ সালের একটি ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার কথা বলিব; তাহা হইতে বুঝা যাইবে, আমাদের ভারতের সম্মানবর্ধনকারী কত বড়ো রাজদূত হইয়া রবীন্দ্রনাথ দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন, দেশ হইতে দেশান্তরে তাঁহার বাণী পাঠাইয়াছেন।

১৯২২ সালে মে-জুন-জুলাই মাসে আমি ইটালি ও গ্রীসদেশে ভ্রমণ করি। জুলাই মাসে আমি ইটালির ভেনিস নগরে গ্রীক কন্‌সাল বা রাষ্ট্র-প্রতিনিধির দপ্তরে গিয়া গ্রীসদেশে অবতরণের ও গ্রীস-ভ্রমণের অনুমতির জন্য উপস্থিত হইব স্থির করি। ইংরেজ সরকারের তরফ হইতে যে পাসপোর্ট অর্থাৎ রাষ্ট্র-পরিচয়-পত্র আমার ছিল, তাহাতে প্রথমতঃ লণ্ডনের ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-বিভাগের নির্দেশ ও ছাপ করাইয়া লই যে, আমায় গ্রীস দেশে ভ্রমণ করিতে দিতে ব্রিটিশ সরকারের আপত্তি নাই। সেই নির্দেশ দেখাইয়া তবে যে দেশে যাইতেছি সেই দেশের অনুমতি লইতে হইবে। গ্রীক কন্‌সালের আপিসে গিয়া যথানির্দিষ্ট শুল্ক বা মাশুল দিয়া, আমার পাসপোর্টে ছাপ লইতে হইবে যে আমি অবাধে গ্রীস দেশে

ভ্রমণ করিতে পারি ; অন্যথায় সে দেশে আমাকে নামিতেই দিবে না। ভেনিস শহরে গ্রীক কন্‌সালের আপিস খুঁজিয়া বাহির করিলাম। একটি পুরাতন ইটালীয় বাড়িতে দোতলায় দুই-তিনটি ঘর লইয়া আপিস। গ্রীষ্মকাল, ইটালির সূর্য্য যেন আমাদের দেশের মতনই প্রখর। তখন বেলা প্রায় বারোটা বাজে। এখন ফ্রান্স ইটালি প্রভৃতি বহু ইউরোপীয় দেশে এইরূপ নিয়ম আছে যে, আপিস-আদালত-ইস্কুল-কলেজ প্রভৃতি সকালে নয়টা হইতে বারোটা পর্য্যন্ত খোলা থাকে, তাহার পরে বারোটায় সব বন্ধ হইয়া যায়, আবার খোলে সেই দুইটায় বা তিনটায়, তার পরে পাঁচটা বা ছয়টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। মাঝের এই বন্ধের দুই-তিন ঘণ্টা সকলে মাধ্যাহ্নিক ভোজন ও বিশ্রামে অতিবাহিত করে। গ্রীক কন্‌সালের আপিস তখন বন্ধ হইবার সময় ; জানালাগুলি বন্ধ হইতেছে। তখনই আমার কাজটুকু সারিয়া না গেলে সেই রৌদ্রে আমাকে আবার দুই বা আড়াই ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিতে হয়। কপাল ঠুকিয়া দোতলায় উঠিয়া আপিস-ঘরের রুদ্ধ দ্বারের বাহিরের ঘণ্টার দড়ি ধরিয়া টান দিলাম। ভিতরে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে একজন ইটালীয় চাকর বাহিরে আসিয়া বলিল, 'দেখিতেছেন না, বারোটা বাজে, আপিস এখন বন্ধ হইতেছে, সেই বিকালে আসিবেন।' আমি তখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ জাতির নাম লইলাম—বলিলাম, 'কন্‌সালকে বলো গিয়ে, আমার ইংরেজ সরকারের পাসপোর্ট আছে'। অর্থাৎ ইংরেজ জাতির সম্মাননা গ্রীসকে করিতে হইবে। কন্‌সালের চাকর ফিরিয়া গেল, একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'আমাদের কন্‌সাল ইংরেজি বলতে পারেন না'। আমি নাছোড়বান্দা, বলিলাম, 'Parla francese ? parla alemana ? পার্লা ফ্রাঞ্চেস ? পার্লা আলেমানা ? তিনি ফরাসী বলেন ? জরমান্ বলেন ?' সভ্য ভাষা, আন্তজাতিক ভাষা ইংরেজি, ফরাসী, জরমান্—এই তিনটার একটাও তো জানা উচিত। ভৃত্য এবার গিয়া কন্‌সালকে বলিল।

ফিরিয়া আসিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া কন্‌সাল সাহেবের সামনে হাজির করিল। তখন দেখি ঘরের জানালা বন্ধ, ঘর অন্ধকার, কন্‌সাল-ও মধ্যাহ্নভোজনের জন্য ছড়ি টুপি লইয়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত ; কিন্তু কী করেন, ইংরেজ সরকারের দোহাই পাওয়ায় অগত্যা কোনও ইংরেজ পুঙ্গবের খেদমতের জন্য হাজির রহিয়াছেন নিতান্ত অ-খুশী মনে। কিন্তু আমাকে দেখিয়া-ই ফরাসীতে বলিলেন, 'ah, mais vous n'êtes pas anglais ! আ, মে ভু নেৎ পাযাঁগ্‌লে ! আঃ, কই, আপনি তো ইংরেজ নন্‌ !' উত্তরে বলিলাম, 'না, আমি ভারতীয়'। শুনিয়াই ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত-ভাবে বলিলেন, 'ভারতীয় ! বসুন মশায়, বসুন ! আমি রাবীন্দ্রানাত্‌ তাগোরের বই প'ড়েছি !' আমি ভারতীয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশের লোক, এই পরিচয় যেন যথেষ্ট ; আমাকে ভদ্রলোক অত্যন্ত অন্তরঙ্গ-ভাবে গ্রহণ করিলেন। ফরাসীতে তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইল ; দেখিলাম, তিনি আমাদের সংস্কৃত "রামাইয়ানা" আর "মাখাবারাতা"র-ও খবর রাখেন, তাঁহার দেশের একজন বড়ো কবি আধুনিক গ্রীক ভাষায় "নালাস্‌" আর "দামাইয়ান্দী"-র কাহিনী মূল সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করিয়াছেন সে কথা বলিলেন ;—আর রবীন্দ্রনাথের লেখার সম্বন্ধে তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ কবি একজন ইংরেজি থেকে গ্রীকে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি', 'গার্ডনার', আর 'সাধনা'র অনুবাদ করিয়াছেন। ভদ্রলোক তখন-ই আমার পাসপোর্ট্‌-এ ছাপ দিয়া দিলেন, আইন-মোতাবেক যথা কর্তব্য তখন-ই চুকাইয়া দিলেন ; উপরন্তু গ্রীসের রাজধানী আথেন্সে দুই একটি শস্তা অথচ ভদ্র হোটেলের ঠিকানা দিলেন, গ্রীসে ভ্রমণ সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিলেন, আর নানা বিষয়ে খানিক আলাপ করিলেন। প্রায় ৪০ মিনিট এইভাবে সদালাপ ও শিষ্টাচার করিলেন —রবীন্দ্রনাথের দেশের লোক পাইয়াছেন বলিয়া। এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা গেল, রবীন্দ্রনাথের মতো দেশগৌরব ভারত-সন্তানের কল্যাণে ভারতবর্ষের জনসাধারণ কতটা মর্যাদার এবং হৃদ্যতার

অধিকারী হইতে পারে।

এরূপ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি দেওয়া যায়। যাঁহারা-ই ইদানীং বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই এই প্রকারের অভিজ্ঞতার কথা বলিতে পারেন। 'বাক্‌পতি' রবীন্দ্রনাথ, 'কবি-গুরু', 'কবি-সম্রাট্', 'কবি-সার্বভৌম' রবীন্দ্রনাথ, 'সমগ্র এশিয়া-খণ্ডের **Poet Laureate** বা 'রাজকবি' রবীন্দ্রনাথ, 'ভারত-ভাস্কর' রবীন্দ্রনাথ, 'দেশনেতা' বা 'রাষ্ট্রনেতা' রবীন্দ্রনাথ, 'বিশ্বমানবিকতার অগ্রদূত' রবীন্দ্রনাথ, 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' রবীন্দ্রনাথ, 'কর্মী' রবীন্দ্রনাথ, 'শিক্ষাব্রতী' রবীন্দ্রনাথ, 'সংগীত-নায়ক' রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের বহুবিধ পরিচয় আছে ; এগুলির কৃতিত্ব তাঁহার দেশ, সমাজ ও যুগকে উজ্জ্বল করিয়াছে ; এগুলির মধ্যে 'ভারত-রাজদূত' রবীন্দ্রনাথের অবদান ও কৃতিত্ব কিছু কম নহে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনার মধ্যে, তাঁহার কাব্য, গান, গানের সুর, চিত্র, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধাদির মধ্যে, তাঁহার বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতনের মধ্যে চিরজীবী হইয়া থাকিবেন ; কিন্তু জীবৎকালে তাঁহার সাহিত্যিক কৃতিত্বের পার্শ্বে তাঁহার জীবন্ত ব্যক্তিত্ব ভারতকে ও ভারতবাসীকে যেভাবে বাহিরের জগতের গৌরব ও মর্যাদা দিয়া গিয়াছে, ভারত ও ভারত-বাসী তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে-সঙ্গে তাহা হইতে অনেকটা বঞ্চিত হইতে চলিল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকে আমাদের লাভ-লোকসান-খতানো পাটোয়ারী বুদ্ধি অনুসারে আমরা যেন না দেখি ; কিন্তু রবীন্দ্রের অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে গৌরবও যে কতটা ম্লান হইল, তাহা মনে করিয়া, এই গুরুতর দুর্ভাগ্যের গুরুত্ব সমগ্র ভারতীয় জাতির দিক্ হইতে কতকটা যেন আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩৪৮।

মেক্সিকোতে রবীন্দ্র-সাহিত্য

দেশীয়-জাতির প্রকৃতির

১৯৫২ সালে জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি মাসে আমার মেক্সিকো দেশ দেখে আসবার একটু সুযোগ ঘ'টেছিল। ছ'মাসের জন্য আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া শহরের অন্যতর বিশ্ববিদ্যালয় পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া ইউনিভারসিটির দ্বারা অধ্যাপনার জন্য আমন্ত্রিত হই। ছ'মাস ফিলাডেলফিয়াতে কাটবার পরে মেক্সিকো দেশে ঘুরে আস্‌বার সুযোগ পাই। মেক্সিকো নানা বিষয়ে আমেরিকার সংযুক্তরাষ্ট্রের থেকে একেবারে আলাদা, এবং আর কতকগুলি বিষয়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে মেক্সিকোর খুব মিল আছে। দেশটি ভারতবর্ষের প্রায় **antipodes**-এ অবস্থিত—অর্থাৎ ভূ-গোলকে ভারতবর্ষের ঠিক বিপরীত দিকে মেক্সিকো অবস্থিত। দেশটিতে প্রাচীন আর আধুনিকের এক অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়। কলম্বস-কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের বহু পূর্বে, ইউরোপ থেকে স্প্যানিশ জাতির মানুষের আমেরিকা-মহাদেশে পদার্পণ ঘট্‌বার বহু শতাব্দীর পূর্ব থেকেই, মেক্সিকোর অধিবাসীরা একটি বড়ো-দরের সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিল। নাহুয়া, জাপোতেক, মিস্তেক, মায়া প্রভৃতি নানা উপজাতির লোকেরা, যীশু-খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব থেকেই একটা উঁচু-দরের সভ্যতা গ'ড়ে তোলে। এই সভ্যতার একটা অদ্ভুত কথা এই যে, এরা লোহার ব্যবহার জানত না—ধাতুর মধ্যে এরা তামা সোনা আর রূপো এই কয়টি জান্‌ত। এদের কাট্‌বার, কঠিন বস্তু ছেদন কর্‌বার একমাত্র অস্ত্র ছিল পাথর। পাথরেরই ছেনি দিয়ে বড়ো-বড়ো পাথর কেটে যে এরা বিরাট বিরাট মন্দির আর অন্য প্রাসাদ আর ভাস্কর্য্য প্রভৃতি তৈরি ক'রে গিয়েছে, তা দেখে এখন আমাদের বিস্ময় লাগে। এদের নিজেদের ধর্ম আর দেবতা, নানা শিল্পকলা, সুসংবদ্ধ সমাজ, বড়ো-বড়ো সাম্রাজ্য, এ-সব ছিল। কিন্তু স্পেন থেকে ইউরোপীয়েরা গিয়ে এদের মধ্যে এক উৎপাতের মতো দেখা দিলে; আর এদের প্রাচীন সভ্যতা এই আক্রমণকারী স্পেনীয়দের

হাতে ধ্বংস পেলে। এখন মেক্সিকোর লোকেরা হ'চ্ছে, প্রাচীন মেক্সিকোর নানা উপজাতির মানুষ আর তাদের উপরে যারা দোর্দন্ড প্রতাপে এই সাড়ে-চার শ' বছর ধ'রে শাসন ক'রে আস্ছে, সেই স্পেনীয় জাতির মানুষ, এদের মিশ্রণের ফল। প্রাচীন ধর্ম এদের আর নেই, জোর ক'রে স্পেনীয়রা এদের রোমান-কাথলিক ক'রে দিয়েছে। প্রাচীন মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ এখন প্রত্নতত্ত্বের আলোচনার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বিশুদ্ধ আদিম অধিবাসীরা এখনও শতকরা প্রায় চল্লিশ হবে। আর বাকি ষাট হ'চ্ছে, স্পেনীয় আর আমেরিকার সুসভ্য আদিম জাতির মিশ্রণ-জাত। যারা বিশুদ্ধ স্প্যানিশ ছিল তারা এখন এই মিশ্র জাতির মধ্যেই মিশে গিয়েছে বা যাচ্ছে। ভাষায় এরা এখন স্পেনীয় হ'য়ে যাচ্ছে। নাহুয়া, মায়া, মিস্তেক, জাপোতেক, ওতোমি প্রভৃতি নানা ভাষা জনসাধারণ ঘরে ব্যবহার ক'রলেও, এ-সব ভাষার সাহিত্য নেই, সকলেই ইস্কুলে কলেজে স্প্যানিশ শেখে, আর স্প্যানিশ-ই এদের সাধারণ ভাষা হ'য়ে যাচ্ছে। স্প্যানিশ ভাষার মাধ্যমেই বাইরের জগতের সঙ্গে এদের যোগাযোগ হ'য়ে থাকে। এক হিসাবে ধ'র্তে গেলে, এরা এখন স্পেনীয় জাতেরই যেন একটি শাখা, যদিও এদের জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে, রীতি-নীতিতে, মনোভাবে আর চিন্তা-প্রণালীতে আদিম আমেরিকার বৈশিষ্ট্য অনেকটা-ই দেখ্তে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে যেমন আর্য্য আর অনার্য্য মিশে ভারতীয় হিন্দু জাতির সৃষ্টি, মেক্সিকোতেও তেমনি সুসভ্য আদিম আমেরিকান জাতি আর স্পেনীয় জাতি, এই দুটি মিলে আধুনিক মেক্সিকান জাতি। মেক্সিকোতে যাবার আগ্রহ এই জন্য ছিল যে, সেখানে গিয়ে, এই অভিনব মেক্সিকান জাতি কিভাবে গ'ড়ে উঠেছে আর উঠ্ছে, তার একটু চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করা।

মেক্সিকো দেশের রাজধানীর নাম হ'চ্ছে 'মেক্সিকো নগর'। স্পেনীয়রা ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে মেক্সিকো জয় করে। তার কয়েক শত বৎসর পূর্বেই এই মেক্সিকো শহরের গোড়াপত্তন হ'য়েছিল।

মেক্সিকো নগরটি এখন আমেরিকান মহাদেশের এক প্রধান নগর। এই নগরের স্বকীয় একটা রূপ আর বৈশিষ্ট্য আছে। প্রাচীন আমেরিকাযুগের অনেক ভগ্নাংশ আর স্পেনীয়দের দান অনেক নোতুন জিনিসের মিশ্রণে শহরটি অপূর্ব।

আমি মেক্সিকো শহর আর মেক্সিকান জাতির পর্য্যালোচনা করবার জন্যই ওদেশে যাই। এখনকার মেক্সিকান শিক্ষিত ব্যক্তিরা রক্তে কোথাও শুদ্ধ আমেরিকান, কোথাও বা মিশ্র, আর কোথাও বা শুদ্ধ স্প্যানিশ হ'লেও, একটি উন্নত মনোভাবের জাতি। মেক্সিকোতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। জনশিক্ষার প্রচারও খুব বেশি। মেক্সিকোর আধুনিক শিল্পকলা এ যুগের শিল্পে কতকগুলি নোতুন ধারা এনে দিয়েছে। বাইরের জগতের হাওয়া এদের মনে খুব-ই খেল্‌ছে।

এহেন মেক্সিকোতে গিয়ে একটি অপ্রত্যাশিত ব্যাপার দেখে যেমন বিস্মিত তেমনি প্রীতও হ'লুম। সেটি হ'চ্ছে—আধুনিক মেক্সিকোর শিক্ষিত আর বিদগ্ধ সমাজের মনে ভারতবর্ষের প্রভাব, আর সেই প্রভাব এসেছে স্বামী বিবেকানন্দ আর রবীন্দ্রনাথের রচনাকে অবলম্বন ক'রে। মেক্সিকো শহরে পেঁছিবার দু'দিন পরেই আমাদের ভারতবর্ষের রাজদূত মেক্সিকো দেশে পদার্পণ ক'রলেন। সংযুক্তরাষ্ট্র আর মেক্সিকো—আমেরিকার এই দুই দেশের জন্য একজন রাজদূত-ই নিযুক্ত আছেন। ১৯৫১-৫২ সালে আমাদের রাজদূত ছিলেন শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন। ইনি যোগ্যতার সঙ্গে নিজের কর্তব্য পরিচালনা করেন, আর ওয়াশিংটন থেকে মেক্সিকোতে আসেন ভারত-সরকারের পরিচয়-পত্র মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতির কাছে দাখিল কর্‌বার জন্য। শ্রীযুক্ত সেন ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্র ছিলেন। মেক্সিকোতে তাঁর সাহচর্য্য কর্‌বার আমার খুব-ই সুযোগ মেলে, আর তাঁর সঙ্গে আমি কয়েকটি জায়গায় ঘুরি। দু'একটি বিষয়ে স্বদেশের জন্য তাঁর সঙ্গে মিলে একটু কাজ করবার সুযোগও আমি পাই।

ভারতবর্ষের রাজদূত মেক্সিকোতে এসেছেন—মেক্সিকোর অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্র আর কয়েকজন অধ্যাপক। এঁরা সকলেই চান—ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছু জান্‌তে, আর ভারতবর্ষ আর মেক্সিকো এই দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগ কি ক'রে পাকা করা যায়, আর ছাত্রেরা বিশেষ-ভাবে জান্‌তে চায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে। ভারতের রাজদূত অল্প কয়দিনের জন্য মেক্সিকোয় গিয়েছিলেন, তাঁকে তখন নানা কাজে ব্যস্ত থাক্‌তে হ'ত। এই সাংস্কৃতিক ব্যাপারে জিজ্ঞাসু মেক্সিকান অধ্যাপক আর ছাত্রদের কাছে তিনি আমার কথা বলেন—ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার অধ্যাপক এসেছেন, তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আপনারা আলাপ করুন, তিনি-ই আপনাদের নানা খবর দিতে পারবেন; আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল, রবীন্দ্রনাথের কথাও তিনি অনেক ব'ল্‌তে পারবেন। আমাকেও তিনি খবর পাঠিয়ে দিলেন, আর আমার হোটেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এঁদের ব'লে দিলেন।

এই ভাবে মেক্সিকো শহরের প্রাচীন ও আধুনিকের উত্তরাধিকারী এই নবীন মেক্সিকান জাতির কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কারপূত ছাত্র ও অধ্যাপকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ মিত্রতা ঘ'ট্‌ল। এর পূর্বে মেক্সিকো শহরের রাস্তায় চলাফেরা করবার সময়ে একটি জিনিস দেখে আমি চ'ম্‌কে যাই। আমাদের দেশের মতোই বড়ো রাস্তার ধারে ফুটপাথের উপর যেখানেই একটু খোলা যায়গা পেয়েছে, সেখানেই নানারকম জিনিসের ফেরিওয়ালারা পসার সাজিয়ে পথ-চল্‌তি লোকের কাছে নিজেদের জিনিস বিক্রি ক'র্‌ছে—কোথাও ফল, কোথাও বা চকোলেট বা নানা রকমের মিষ্টি, কোথাও নানা মণিহারি জিনিস, আর কোথাও বই। এই রকম ফুটপাথের ধারে ছোটো-খাটো সাজানো বইয়ের দোকান দেখ্‌লে দাঁড়িয়ে প'ড়্‌তুম। এ-বই ও-বই সে-বই হাঁটকে

একটু দেখ্‌তুম, আর কখনও অল্প দামে দু'-একখানা কিন্‌তুমও। সব বই স্প্যানিশ ভাষায় লেখা। বই আছে, ক্যালেন্ডার আছে, খাতা-পেন্‌সিলও আছে। বেশির ভাগ বই-ই বাজে উপন্যাসের—প্রেম আর খুনোখুনির ব্যাপার নিয়েই। আবার স্প্যানিশ ভাষার পুরাতন আর আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকদেরও বই বেশ পাওয়া যায়। এই রকম একটি ছোটো দোকানে হঠাৎ দেখি স্প্যানিশ ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের বই—যেমন 'রাজযোগ', 'মদীয় আচার্যদেব', 'শিকাগো বক্তৃতা' ইত্যাদি। দেখে তো অদ্ভুত লাগ্‌ল। তারপরে আরও দেখ্‌লুম রবীন্দ্রনাথের বইয়েরও স্প্যানিশ অনুবাদ। এগুলি বাজে ডিটেক্‌টিভ নভেল আর রোমান-কাথলিক ধর্মের বই আর যৌন-আবেদনের নানা ছাইপাঁশ বই এ-সবের পাশে এই বইও বিক্রি হ'চ্ছে। এর মানে এই নয় যে, মেক্সিকোর পথ-চল্‌তি মানুষ সকলেই বিবেকানন্দ আর রবীন্দ্রনাথের লেখা কিনে পড়ে। তবে এটা নিশ্চয় যে, দু'-চারজন লোক অবশ্যই আছেন যাঁদের কাছে এই-সব বইয়ের চাহিদা আছে, আর তাঁদের জন্যই ফেরিওয়ালারা এই সব বই এনে রাখে। সুদূর মেক্সিকোর সাধারণ মানুষের অন্ততঃ একটি শ্রেণীর কাছে ভারতীয় চিন্তা ও দর্শন আর ভারতীয় কবিতা ও উপন্যাস-এর একটা আবেদন নিশ্চয়ই পৌঁছেছে, এবং সেখানে এর কিছুটা আদরও হ'য়েছে।

ইউনিভারসিটির এই ছাত্র আর অধ্যাপকদের পেয়ে আমি খুব-ই খুশি হ'লুম। বিশেষতঃ এই সব তরুণ ছাত্রছাত্রীদের পেয়ে। অধ্যাপকেরা চান যাতে ভারতবর্ষের সঙ্গে মেক্সিকোর একটা ভাবগত আদান-প্রদানের কায়েমী বন্দোবস্ত আমাদের রাজদূত ক'রে দিয়ে যান, এই বন্দোবস্ত অনুসারে যাতে ক'রে ভারতবর্ষের অধ্যাপক আর ছাত্র মেক্সিকোয় আস্‌তে পারেন, আর মেক্সিকোর ছাত্র আর অধ্যাপক ভারতবর্ষে যেতে পারেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা চায়, আমি যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত আর তাঁর-ই নগর-ক'লকাতার অধিবাসী, বিশ্ববিদ্যালয়ে

এসে ছাত্রদের কাছে আমি যেন একদিন রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ করি। এ বিষয়ে দেখ্‌লুম জন দশ-বারো ছাত্রের উৎসাহ বেশি। এদের মধ্যে তিন চারটি মেয়েও ছিল। এরা সকলেই কলেজে পড়ে—কেউ বিজ্ঞান, কেউ সাহিত্য, কেউ দর্শন আর কেউ আইন। এই ছাত্রদের সঙ্গে আমার বেশ সদ্ভাব হ'য়ে গেল, যদিও এদের সঙ্গে মেলামেশা কর্‌বার জন্য আমি তিনটি কি চারটি দিনের বেশি পাই নি। এরা আমাকে ব'ল্‌লে যে, এদের মধ্যে একটা ছোটো পাঠচক্র গ'ড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে—এরা তার নাম দিয়েছে **Grupo Rabindranath Tagore** (গ্রুপো রাবিন্দ্রানাৎ তাগোরে)। এই পাঠচক্রে এরা নিয়মিত ভাবে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা ক'রে থাকে। ইংরিজিতে রবীন্দ্রনাথের লেখা যা বেরিয়েছে, সে সবেরই স্প্যানিশ অনুবাদ হ'য়েছে—কতকগুলি বই স্পেন দেশে, কতকগুলি আমেরিকার আর্জেণ্টিনায় আর অন্যত্র। আবার এই-সব অনুবাদকে অবলম্বন ক'রে একটি নাতিক্ষুদ্র রবীন্দ্র-রচনার চয়নিকাও স্প্যানিশ ভাষায় বেরিয়েছে। ছাত্রেরা এই বই আমাকে দেখালে—এদের হাতে তিন-চার খণ্ড এই বই ছিল। আর আমি এই বই দুই-একখানি ওদের কাছ থেকে নিয়ে পাতা উল্‌টে দেখ্‌লুম—অনেক জায়গাতেই পাঠকেরা লাল নীল বা কালো পেন্‌সিলে বা কালিতে দাগ দিয়ে রেখেছে—রবীন্দ্রনাথের যে-সব রচনার অংশ তাদের ভালো লেগেছে।

এটা দেখে একজন ভারতবাসী বা বাঙালীর মনে একটা আনন্দ হবারই কথা। অপর গোলার্ধের একেবারে উল্‌টো দিকে এতগুলি তরুণ-তরুণীর সঙ্গে, প্রবীণ অধ্যাপকের সঙ্গে একটা ভারসাম্য পাওয়া গেল—এটা কি কম কথা। এদের সঙ্গে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের কাছে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে আমি সানন্দে সম্মত হলুম। এদের সঙ্গে আরও দুই-একটি বিষয়ে আমার আলোচনা হ'ল। একদিন এরা আমাকে ধরে নিয়ে গেল একটি দামী মেক্সিকান হোটেলে আমাকে খাওয়াবে ব'লে। সেখানে

বিশুদ্ধ মেক্সিকান ভোজ্য আমাকে খাওয়ালে। আমি ওদের জিজ্ঞাসা ক'রলুম, বলো তো, তোমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এমন কী পেয়েছ যার জন্যে তাঁর বই এইভাবে যত্ন ক'রে প'ড়্ছ আর তাঁর কথা শুন্‌তে চাইছ? তাতে দু'-তিনটি ছেলে বললে, দেখুন, উনি জীবনের সম্বন্ধে প্রেমের সম্বন্ধে, মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে এত খাঁটি কথা এমন মিষ্টি ক'রে বলেছেন, তেমনটি আমরা সাধারণতঃ পাই না। এইজন্যে এঁর বই পড়ে আনন্দ পাই, এঁকে ছাড়তে পারি না। আমি বললুম, এহ বাহ্য, ভিতরের কথা কী বলো। জীবন, প্রেম, মানুষের পুরুষার্থ এ-সব নিয়ে ইউরোপেও বড়ো-বড়ো কবি খুব ভালো-ভালো কথা অনেক বলে গিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ হয়তো খুব মিষ্টি করে বলেছেন, কিন্তু তাতে তাঁর বৈশিষ্ট্য কোথায়? তখন এরা একটু ভেবে ব'ললে, এঁর মধ্যে আমরা পাই একটা বিশ্বমানবিকতার বাণী, সব মানুষ যে এক আর সকলের মধ্যেই যে-নিজেকে আমরা পেতে পারি সেই কথা। আমি বললুম, এও তো নোতুন কথা নয়, প্রাচীন আধুনিক সব দেশেরই বিশ্বকবিদের মধ্যে এ ধরনের বিশ্বমানবিকতা তো দুর্লভ বস্তু নয়। তখন এদের মধ্যে দু-একজন একটু ভেবে ব'ল্‌লে, দেখুন, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অতীন্দ্রিয় জগতের একটা আভাস পাই, এমন একটা আধ্যাত্মিকতার সুর তাঁর লেখার মধ্যে আছে যেটা মানুষকে উঁচুতে তুলে নিয়ে যায়, আর মানুষকে আকুল করে,—এটা তো আর সব কবির মধ্যে পাই না। আমি ব'ললুম, আমাদেরও তাই মনে হয়, আর সেই জন্যেই রবীন্দ্রনাথের লেখা আমাদের মনের আর হৃদয়ের বস্তু হ'য়ে আছে —জীবন, মানব আর শাশ্বত সত্তা, এই তিন-ই তাঁর প্রতিভার ঝলকে অদ্ভুত সুন্দরভাবে প্রকাশিত হ'য়েছে।

আমি এদের ব্যবস্থা মতো মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কলেজে আহূত ছাত্রদের একটি সভাতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে এলুম। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে ব'ল্‌লুম। শ্রোতার সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হবে—ইংরিজি সকলে বোঝে না, তবে অনেকেই বোঝে,

সেইজন্য চট্‌ ক'রে পঞ্চাশের বেশি শ্রোতা সংগ্রহ করা বোধ হয় কঠিন হয়। বক্তৃতার পর এদের মধ্যে কেউ-কেউ প্রশ্ন ক'র্‌লে—কতকগুলি প্রশ্ন বোকার মতন, ছেলেমানুষের মতন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞতারই পরিচায়ক; আবার দু'চারটি প্রশ্ন বেশ বুদ্ধিমানের মতো, তার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টিও মেলানো ছিল। বক্তৃতা সাঙ্গ হবার পরে, চমৎকার ইংরিজিতে একজন অধ্যাপক আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। ইনি বললেন, যখন আমরা ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করি, তখন ভারতবর্ষের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর আর তার সমন্বয় প্রবৃত্তির কাছে আমাদের মন সম্ভ্রমে নত হয়ে যায়, আমাদের নিজেদের যেন অনেকটা খর্ব ব'লে মনে হয়। এর জবাবেও আমাকে ব'ল্‌তে হ'ল, আমাদের এখন যা অবস্থা তাতে প্রাচীন ভারতের কতকগুলি আদর্শ—যার একটা আবেদন এখনও বিশ্বমানবের কাছে আছে—তা থেকে আমরা কতটা ভ্রষ্ট হ'য়ে প'ড়্‌ছি, সেকথা যখন ভাবি তখন আমরা নিজেদের লজ্জা রাখ্‌বার স্থান পাই না।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিশ্বব্যাপী আবেদন আর প্রভাব আমরা এইভাবে পৃথিবীর সর্বত্র-ই দেখ্‌তে পাই। রবীন্দ্রনাথ এমন জিনিস সব দেশের সব জাতির সব কালের মানুষকে দিয়ে গিয়েছেন যে, সে জিনিস কেউ ছাড়তে পার্‌বে না, তা সর্বত্র সকলের হৃদয়ের ধন হ'য়ে থাক্‌বে।

শনিবারের চিঠি, রবীন্দ্র-সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৭।

লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথ

[১৯২০-১৯২১]

বিশ বছরের উপর হ'য়ে গেল, তখন লণ্ডনে ছাত্র-জীবন যাপন ক'র্ছি ; লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর-অভ-লিটরেচর পরীক্ষার জন্য 'গবেষণামূলক' বই লিখ্ছি, আর তা ছাড়া ভাষা, সাহিত্য আর ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত কতকগুলি বিষয় নিয়ে লণ্ডনের বিভিন্ন কলেজে পড়াশুনা ক'র্ছি। বেশ উৎসাহের সঙ্গে লণ্ডনের মত সভ্যতার কেন্দ্রে প্রাপ্তব্য মানসিক সংস্কৃতির কতকগুলি দিক্ অনুশীলন ক'র্ছি নানা জাতির ছাত্রের সঙ্গে, নানা জাতীয় লোকের সঙ্গে, বিখ্যাত বিখ্যাত ইংরেজ আর অন্য দেশের পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'চ্ছে ; ব্রিটিশ মিউজিয়মের পাঠাগারে যাচ্ছি, নানা মিউজিয়ম ঘুরে' ঘুরে' দেখ্ছি, থিয়েটরে নামী লেখকের লেখা নাটকের অভিনয় দেখে আস্ছি, মাঝে মাঝে লণ্ডনের আশেপাশে ইংলাণ্ডের পল্লীজীবনের সঙ্গেও একটু-আধটু চাক্ষুষ পরিচয় ক'রে আস্ছি। মোটের উপর, সব দিক্ থেকেই মনের মধ্যে যেন একটা নতুন জীবনের প্রবাহ অনুভব ক'র্ছি। স্যর্ জ্যর্জ্ আব্রাহাম গ্রিয়র্সন্-এর মত প্রখ্যাতনামা ভাষাতাত্ত্বিকের প্রীতিসিক্ত, আমার মত ছাত্র-জনের বিশেষ কাম্য, শিষ্যত্ব লাভ ক'রেছি ; ডেন্মার্ক-এর অধ্যাপক অটো য়েস্পর্সেন্-এর সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছে ; অনেক জিনিস জান্বার শোন্বার দেখ্বার, আর নানা উপায়ে নিজের দৃষ্টি, বিচার আর অনুভবের শক্তিকে বাড়িয়ে' তোল্বার সুযোগ পাচ্ছি। ব্রিটিশ **Y. M. C. A.** বা খ্রীষ্টীয়-যুব-সঙ্ঘের কর্তাদের দ্বারায় পরিচালিত একটী আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে বাস ক'র্ছি —এখানে ইউরোপের নানা জাতির কুড়িজন, আর তিরিশজন ব্রিটিশজাতীয়—ইংরেজ, ওয়েল্শ্, স্কট, আইরিশ—এই পঞ্চাশজন ইউরোপীয় ছাত্রের মধ্যে আমি, আর আমার সঙ্গে আর একজন ভারতীয়—বাঙ্লাদেশে বহুকাল বাস ক'রেছিল ব'লে একটু-আধটু বাঙ্লা ব'লতে পারে এমন একটী তামিল ছেলে—এই দুইজন ভারতীয় আমরা একত্র আছি। একটী ইটালীয়, কতকগুলি রুমানীয়, একটী যুগোশ্লাব, কতকগুলি সুইস ও অস্ট্রিয়ান, একটী

গ্রীক, একটী মিসরীয় ; এ ছাড়া কতকগুলি ব্রিটিশ ছাত্রের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা হ'য়েছে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মে-জুন মাস ; চমৎকার আলোক-উদ্ভাসিত, সবুজের প্লাবনে ভরা ইংলাণ্ডের গ্রীষ্মকাল ; এই সময়ের প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক মিনিটটী যেন উপভোগ্য। মাঝে মাঝে লণ্ডনের বাইরে পাড়াগাঁ অঞ্চলে একটু বেড়াতে যাই, কখনও একা, কখনও ওদেশী বন্ধু জুটিয়ে' সদলে। এমন সময়ে খবর পেলুম, রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষ থেকে ইংলাণ্ডে এসেছেন, তিনি লণ্ডন হয়ে অক্সফোর্ড-এ গিয়েছেন, আবার শীঘ্রই লণ্ডনে ফিরে এসে কিছুকাল সেখানেই অবস্থান ক'র্‌বেন।

রবীন্দ্রনাথকে প্রথম চাক্ষুষ দেখি স্বদেশী আন্দোলনের গোড়ার দিকেই—বোধহয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টি-টিউশনে (এখনকার দিনের বিদ্যাসাগর কলেজে) 'ডন সোসাইটি' নামক কলেজের যুবকদের একটী ক্লাব বা সভায় (যে সভা থেকে তখনকার দিনের পক্ষে খুবই উচ্চকোটির একখানি সংস্কৃত-মূলক ইংরেজী পত্রিকা বার হ'ত—**the Dawn Society's Magazine** ; অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডন সোসাইটির পরিচালক ছিলেন), রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিয়েছিলেন ; বিষয়টী ছিল, যতদূর মনে হ'চ্ছে, দেশের অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে শিক্ষা বা অক্ষর-পরিচয় প্রচারের জন্য যুবকদের কর্তব্য। পরে কলেজে প'ড়্‌তে-প'ড়্‌তে ক'লকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটে একদিন রবীন্দ্রনাথের দর্শনলাভ হয়—এটা দ্বিতীয় দর্শন—কি একটা সভায় রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন, সেখানে স্বর্গীয় স্যর্‌ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্বন্ধে তিনি একটী গান গেয়েছিলেন, সে গানটী তখন থেকেই আমার মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছিল,—"তুমি কেমন ক'রে গান করো হে গুণী, আমি অবাক্‌ হ'য়ে শুনি, কেবল শুনি!" এই গানটী। সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজে যেবার তিনি "আত্মপরিচয়" ব'লে প্রবন্ধ পড়েন, সেবারও তাঁর দর্শনলাভ আর পাঠ-শ্রবণ ঘটেছিল। তার পরে এম্‌-এ পাস কর্‌বার পরে, শান্তিনিকেতনে যাই, সেখানে তাঁর সঙ্গে

বাঙ্‌লা ভাষা নিয়ে প্রথম আলোচনা করি ; তখন আমি বাঙ্‌লা ভাষার ইতিহাসের নষ্টকোষ্ঠি উদ্ধার কর্‌বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পড়াশুনা ক'র্‌তে আরম্ভ ক'রেছি মাত্র। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী-বিভাগে সহকারী অধ্যাপকের পদ পাই ; সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কতকগুলি বিখ্যাত সাহিত্যিকের সংস্পর্শে আসি ; শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গেও পরিচিত হই, "সবুজ পত্র"তে পরে আমার লেখাও দুই-একটী বেরোয়। "বিচিত্রা" আলোচনী সভা কবির চেষ্টায় ঠাকুর-বাড়ীতে স্থাপিত হয়, তাতে আমন্ত্রণ পাই,—কবির "ডাকঘর" আর "ফাল্গুনী"র অপূর্ব অভিনয়ও দেখি। এইরূপে আস্তে-আস্তে দেশে থাক্‌তে-থাক্‌তে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। আমি যে 'ভাষাতত্ত্ব' নিয়ে পড়াশুনা ক'রছি, সে খবর তাঁর কাছে পৌঁচেছিল। সুতরাং আমি বিলেতে থাক্‌তে-থাক্‌তে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পাবার যে একটা সুযোগ আমার পক্ষে হ'তে পার্‌বে, তা ভেবে মনে-মনে বিশেষ আনন্দিত হ'লুম।

রবীন্দ্রনাথ কোন্‌ তারিখে লণ্ডনে এসে পৌঁচেছিলেন তা মনে নেই। তাঁর বাসার সন্ধান না পাওয়ায় প্রথমেই তাঁর কাছে গিয়ে উঠ্‌তে পারি নি। জুন মাসের গোড়ায় শুনলুম, রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনার জন্য ১২ই জুন তারিখে Y.M.C.A.-দ্বারা পরিচালিত ভারতীয় ছাত্রাবাসে আর ক্লাবে একটী সভা হবে। ঐ সময়ে, ১০ই জুন ছিল আমার একটা পরীক্ষা, পরীক্ষার জন্য একটু ব্যস্ত থাকায়, আর ঠিক ঐ সময়ে আমাদের ইউনিভর্সিটি কলেজের ফনেটিক্স বিভাগে ক্যোপ্‌ন্‌-হাগ্‌নের বিখ্যাত অধ্যাপক অটো য়েস্পর্‌সেন্‌ আসায়, তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা আর তাঁর সম্মাননার জন্য ডিনারের আয়োজন থাকায়, আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা ক'রে আস্‌তে পারি নি। পরীক্ষা চুক্‌ল ১২ই দুপুরে, আর সন্ধ্যায় ছিল ভারতীয় ছাত্রাবাসে, গাওয়ার স্ট্রীটের তখনকার দিনের বিখ্যাত

কাঠের বাড়ী শেক্‌স্পিয়র-হাট্‌-এ রবীন্দ্র-স্বাগত-সভা। ইতিপূর্বে বাঙালী ছাত্রেরা সকলকে অনুরোধ ক'রেছিল, ভারতীয় ছাত্রেরা যেন ভারতীয় পোশাক প'রেই সেই সভায় হাজির হন। তদনুসারে আমি ধুতি পাঞ্জাবি শাল ব্যাগে ক'রে সভার স্থল ছাত্রাবাসে নিয়ে যাই, সেখানে একটী বাঙালী বন্ধুর ঘরে বিলিতি কাপড়-চোপড় ছেড়ে সেগুলি প'রে নিই। সভাস্থলে গিয়ে দেখি, যেন দেশেরই কোন সভা; ইংরেজ আর অন্য ইউরোপীয় মেয়ে পুরুষ অনেক আছে, কিন্তু ভারতীয়েরা সকলেই প্রায় "ভারতীয় পোশাকে", অর্থাৎ কোনও-না কোনও রকমের প্রাদেশিক ভারতীয় পোশাক প'রে এসেছে। মারাঠী জরীর আঁচলা বা পাড়ওয়ালা লাল রেশমের বাঁধা-পাগড়ী, তিলক গোখলে এঁরা যেমন প'র্‌তেন; জবরদস্ত শিখ পাগড়ী, লুঙ্গী আর কুল্‌হা মিলিয়ে' পাঞ্জাবী পাগড়ী, রাজপুতানার রঙীন সাফা, মাদ্রাজী জরীপাড় সাদা পাগড়ী ভারতীয় মুসলমানের তুর্কী ফেজ, উত্তর-ভারতের আর গুজরাটের হিন্দুর গোল ফেল্ট্‌ক্যাপ—এই সব রকমারি শিরস্ত্রাণ; তারপরে আচকান, গলা-আঁটা কোট, গলা-খোলা কোট, কোর্তা, পাঞ্জাবি; রঙীন চাদর, জরীপাড় চাদর, শাল; ধুতী, যোধপুরী পাজামা, ঢিলে ইজের; বিলিতি জুতো, নাগরা, মারাঠী চটী; খালি পা, হাঁটু-পর্যন্ত মোজা; সব ছিল। একজন পরিচিত ইংরেজ ছোকরা, একটু বেশি রকম চালাক, এই হরেক রকম ভারতীয় পোশাকের পসার দেখে আমায় চুপিচুপি ব'ল্‌লে—A brave and varied display। যাহোক্‌, সকলে তো সভায় উপস্থিত হয়ে জাঁকিয়ে ব'স্‌ল; ছাত্রদের মধ্যে যারা কর্মকর্তা, তারা ঘোরাফেরা ক'র্‌তে লাগ্‌ল; রবীন্দ্রনাথের প্রতীক্ষায় আমরা সভাগৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে রইলুম; রকমারী দেশী পোশাক পরা এতগুলি ভারতীয়কে রাস্তার ধারে অপেক্ষা ক'রতে দেখে, স্থানীয় পথ-চলতি মেয়ে-পুরুষ ইংরেজদেরও একটা ভীড় জ'মে গেল। রবীন্দ্র-নাথ এলেন, সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ; অনেকেই আমরা তাঁর পায়ের ধুলো

নিয়ে প্রণাম ক'র্‌লুম, স্মিতহাস্যে কারুকে দুই-একটী কুশল জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে-ক'র্‌তে তিনি আমাদের সঙ্গে নির্দিষ্টস্থানে এসে ব'স্‌লেন। সব 'Indian style'-এ করবার চেষ্টায়, তাঁকে চেয়ারে না বসিয়ে', ক্লাবের কাঠের মেঝের উপরে গাল্‌চে পেতে ভারতীয় ধরণে আসর করা হ'য়েছিল। গ্রীষ্মের দিন, অগ্নিকুণ্ডে আগুনের দরকার হয় নি, মেঝেয় ব'সে ঠাণ্ডা লাগবার ভয় ছিল না; আর চমৎকার পারস্যদেশীয় গাল্‌চে সভার জন্য সংগ্রহ ক'রে আনা হ'য়েছিল। আমরা জন-কতক তাঁর সঙ্গে মাটিতে ফরাসের উপরে ব'স্‌লুম, বাকি সব দর্শকেরা—বেশির ভাগ লোক—তিন দিক্‌ ঘিরে চেয়ারেই ব'স্‌ল। অনেক দিনের কথা, সমস্ত কার্যক্রম মনে নেই, তবে কতকগুলি ব্যাপার যা মনে আছে তা ব'ল্‌ছি। আমরা কবির কাছেই ব'স্‌তে পেরেছিলুম, কারণ আমরা ক'জন, দেখলুম, কবির পূর্ব-পরিচিত। দিলীপ রায় ছিলেন, ক্ষিতীশ-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—আরও জন-কয়েক ছিলেন। ছাত্রাবাসের কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন কতকগুলি মহীশূরের ধূপকাঠি যোগাড় ক'রে এনেছিল, কিন্তু সেগুলি জ্বালিয়ে' দেখা গেল যে ধূপদান নেই, কবির সামনে ধূপ জ্বালাবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল, কিন্তু ধূপকাঠি কিসের মধ্যে রাখা হবে সে বিষয়ে কেউ ভাবে নি। একটী বুদ্ধিমান্‌ ছেলের পরামর্শে তখন একখানা সাবান যোগাড় ক'রে তাতে ধূপকাঠিগুলি বিঁধিয়ে' একটী রেকাবির উপরে রেখে রবীন্দ্রনাথের সামনে বসানো হ'ল; গৃহস্থ-ঘরের পূজায় যেমন একটা কলায় বা এক টুকরা শশায় ধূপ বিঁধিয়ে' রাখা হয়। প্রোগ্রামের মধ্যে মুখ্য কার্য ছিল রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত করা; ছাত্রদের তরফ থেকে দুই-একজন বক্তৃতা দিয়ে তাঁর প্রশস্তি ক'রে কার্য সমাধা ক'র্‌লে, তার মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় কিছু ছিল না; আর কবিও উত্তর দিলেন, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মনোহর ভাবে আস্তে-আস্তে তিনি কিছু ব'ল্‌লেন। এই দুই প্রধান কার্যের পূর্বে আর পরে অন্য কতকগুলি ব্যাপার

ছিল—তার মধ্যে আমার বেশ মনে আছে, প্রথম দিকে ছিল কতকগুলি কবিতা পড়া, আর শেষের দিকে দিলীপের গান। একটী গুজরাটী মুসলমান ছেলে, তখনকার দিনে সে শেক্স্পিয়র-হাটের আড্ডায় একজন মাতব্বর ছিল, বহুকাল ধ'রে অধ্যবসায়ের সঙ্গে কেম্ব্রিজ আর লণ্ডনে অধ্যয়ন ক'রছে, পাস আর তার করা হ'চ্ছে না, সে ছোকরা তার স্বরচিত এক ইংরেজী কবিতা প'ড়্লে; কবিতার একটী অপূর্ব লাইন এখনও মনে আছে, তবে তার অর্থটা এখনও ঠিক বুঝে' উঠ্তে পারি নি—Tagore, O Tagore, Launch thy boat ashore। আর একটী মধ্যপ্রদেশের ছাত্র—হিন্দীভাষী—তারস্বরে সুর ক'রে তার হিন্দী কবিতা শোনালে—প্রত্যেক ছত্রটী দুবার ক'রে ক'রে "দোহ্রাইয়া" প'ড়লে, পাছে আমরা রস-গ্রহণ ক'র্তে না পারি সেই আশঙ্কায়। কবিতাটীর আরম্ভটা মনে আছে, সেটা এই রকমের—"স্বস্তি শ্রীরবি-ইন্দ্রনাথ, স্বাগত তুম হো ইস শেকস্পিয়র-হাট্ট মে"—এক 'ইস' ছাড়া সব শব্দগুলি স্বরান্ত ক'রে পড়া হ'ল। কবিতাটীর মধ্যে একটী জোরালো লাইন ছিল; ছোকরা সেটীকে যথারীতি দুবার প'ড়ে "দোহ্রালে," তিনবার প'ড়ে "তেহ্রালে," চারবার প'ড়ে "চৌহ্রালে," কিন্তু দেখ্লে যে তার কৃতিত্বের অন্তর্নিহিত ভাবটুকু কেউ ধ'র্তে পার্লে না—তার পক্ষে চার-চারবার লাইনটী পড়া "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্" হ'ল; লাইনটী এই—"তুম-নে ইন্কে সর-পর লাত মারা।" শেষটায় মরিয়া হ'য়ে কবিটী নিজেই হিন্দী ভাষায় ভাষ্য ক'র্লে—"ইস লাইন কো সোচ কর দেখিয়ে; 'সর' য়হ্ শব্দ দো অর্থ-মেঁ হৈ; চাহে ইসে ইংলিশ 'সর' সমঝিয়ে, চাহে figurative অর্থ-মেঁ লীজিয়ে।" অর্থাৎ লাইনটীর মানে—তুমি এদের সর-এর উপর লাথি মেরেছ; সর—ইংরেজী sir, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে ব্রিটিশ-রাজ-দত্ত নাইট-উপাধি ত্যাগ ক'রেছেন, সেই অর্থে লাইনটী নেওয়া যায়; আর 'সর' মানে মাথা; দ্বিতীয় অর্থটী খুব যে উচ্চ ভাবের পরিচায়ক, তা নয়। যাহোক্ লেখকের নিজের

ভাষ্যে যখন হিন্দী আর উদর্দ্-ওয়ালাদের কাছে অর্থটী সর্পরিস্ফর্ট হ'ল, আর আমাদের মত অহিন্দর্স্থানী বাঙালী মারাঠী গর্জরাটী-দের কাছেও, তখন একটা উৎসাহের ঢেউ খেলে গেল, জালিয়ান-ওয়ালাবাগের পরে রবীন্দ্রনাথ যে স্যর্ উপাধি ত্যাগ ক'রেছিলেন সে কথা স্মরণ ক'রে দেশাত্মবোধের হাওয়ার একটা হিল্লোল এসে সমবেত ভারত-সন্তানদের হৃদয়কে আলোড়িত ক'রে দিয়ে গেল—তার-স্বরে সকলে এই লাইনের তারিফ ক'রে আর খর্শীর সঙ্গে গর্ব-পর্ণ ভাবে রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে' "বন্দে মাতরম্" আর "রবীন্দ্রনাথ-কী জয়" ক'রে উঠ্‌ল। পরিচিত একজন ইংরেজ ভদ্রলোক পিছন থেকে এসে কানে-কানে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "কি ব্যাপার? কবিতা-পাঠে এতটা উৎসাহ কেন? জাতীয় কবিতা বর্ঝি?" কি উত্তর দিই? ব'ল্‌লর্ম, **It is all for a pun, which is thought to be rather neat.** কবিটী তো তখন উৎসাহের সঙ্গে আরও দর্বার তার এই লাইন শোনালে; রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অধোবদন হ'য়ে রইলেন। শেষটায় বোধ হয় দিলীপের গান হ'ল। ঠিক মনে নেই, তবে যেন তিনি তাঁর পিতার "বঙ্গ আমার জননী আমার" গেয়েছিলেন, আর পরে তাঁর অনর্রাগী বন্ধর্দের অনর্রোধে তিনি এই গানটীর ইংরেজী অনর্বাদ (বাঙ্‌লা গানটীর-ই সর্রে) গেয়েছিলেন। এই সহজ সর্রের গানটীতে তাল দেওয়া নিতান্ত আনাড়ি তাল-কাণা লোকের পক্ষেও কঠিন নয়; ইংরেজীতে গানের মানে ধ'র্‌তে পেরে, যারা চেয়ারে ব'সেছিল সেই সব ভারতীয় ছাত্রদের অনেকে কাঠের মেঝেয় পা ঠর্কে-ঠর্কে তাল দিতে লাগ্‌ল।

পরে কবির সঙ্গে, তাঁর এই সংবর্ধনা কেমন লেগেছিল সে-সম্বন্ধে কথা হ'য়েছিল। "তুম্-নে ইন-কে সর-পর"—এই লাইনের কথাও তুলেছিলর্ম। তিনি খালি ব'লেছিলেন, "সব রকমই শর্ন্‌তে হয়, যেতে দাও। তবে ভাবি, এত খরচ-পত্র ক'রে এরা এত দর্র আসে কেন।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মাঝে-মাঝে দেখা ক'র্‌তে যেতুম। দর্ই-

একবার তিনিও আমাকে আস্‌বার জন্য খবর দিয়েছিলেন। তিনি লণ্ডনে মাস-কয়েক থেকে, একবার আমেরিকা ঘুরে এলেন। লণ্ডনে তিনি থাক্‌তে-থাক্‌তে আমরা জন-কয়েকে মিলে ছুটীর মধ্যে স্কটলাণ্ড আর লেক-ডিস্ট্রিক্ট্ বেড়িয়ে' এলুম। আমেরিকা থেকে ফিরে আসবার পরেও তাঁর সঙ্গে খুব দেখা ক'র্‌তে যেতুম। এই কয় মাসের মধ্যে তাঁকে প্রথম একটু অন্তরঙ্গভাবে জান্‌বার সুযোগ আমার হ'য়েছিল। তখন আমার বয়স তিরিশ; বিলেতে প'ড়্‌তে গিয়েছে এমন ভারতীয় ছাত্রেরা বেশির ভাগ আমার চেয়ে বয়সে ছোটো; সুতরাং তাঁর সঙ্গে গুরু-গম্ভীর বিষয়ে আলাপের সুযোগ সহজেই তিনি আমায় দিয়েছিলেন; আর সেটা আমার জীবনে একটা পরম লাভের বস্তু হয়েছিল। কত না বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা, ক্বচিৎ তর্ক জুড়ে' দিয়ে, আমার নিজের মনন-শক্তিকে আমি আগের চেয়ে নির্মল আর স্থূলতাবর্জিত ক'র্‌তে পেরেছি। তাঁর কাছে অনেক বড়-বড় লোক আস্‌তেন। প্রথম বার তিনি ছিলেন Kensington Palace Mansion ব'লে একটী হোটেলে; দ্বিতীয় বার ছিলেন আমাদের বাঙ্‌লাদেশের চট্টগ্রামবাসী একটী বাঙালী ভদ্রলোকের পরিচালিত আর সত্ত্বাধিকারী হিসাবে তাঁর নিজস্ব, Regina Hotel নামে হোটেলে। পরিচয় হ'য়েছিল অনেকের সঙ্গে; কিন্তু কারো সঙ্গে সে আলাপ জীইয়ে' রাখ্‌তে পারি নি, কারণ মানসিক চর্চায় বা আলোচ্য বিষয় নিয়ে' সকলেই আমার সমানধর্মা ছিলেন না। তবে শান্তিনিকেতনের পিয়ার্‌সন্ সাহেব, আর দীনবন্ধু চার্লস এফ্ আণ্ড্রুস্, এঁদের বেশ লেগেছিল। কবিরই বাসায় লরেন্স বিন্‌য়ন, উইলিয়ম রটেন্‌ষ্টাইন, লর্ড সিংহ, স্যর কে. জি. গুপ্ত—এঁদের দেখি; কবির সঙ্গে রটেন্‌ষ্টাইনের বাড়িতে এক ঘরোয়া বা পারিবারিক সান্ধ্য সম্মিলনে যাই, সেখানে আয়র্‌লাণ্ডের কবি ইয়েট্‌স্‌কে দেখি; রটেন্‌ষ্টাইনের বাড়ীতে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে পরম ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত দেখ্‌ত; মনে আছে ঐ দিন কবি তাঁর ইউরোপীয়

বন্ধুদের অনুরোধে দুটী বাংলা গান গেয়েছিলেন, তার মধ্যে "দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে" গানটী ছিল। ইয়েট্‌স ছিলেন একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক, তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার লোভ হ'লেও তেমন সাহস আমার হয় নি, কারণ সাহিত্য-রস-রসিক আমি মোটেই ছিলুম না—তাঁর মত লোকের সঙ্গে কথা কইবার যোগ্যতা আমার ছিল না।

বিখ্যাত রুষ শিল্পী নিকোলাই র‍্যোরিখ ইংলাণ্ডে নির্বাসন-যাপন করছিলেন। ইনি ছিলেন সোভিয়েট বা বলশেভিক তন্ত্রের বিরোধী, সেই জন্য এঁর বিশাল প্রাসাদ, প্রাচীন বস্তুর সংগ্রহ, সব ছেড়ে দিয়ে, দেশ ত্যাগ ক'রে বাইরে এসে এঁকে থাকতে হ'য়েছিল। এঁর দুই ছেলের মধ্যে বড় ছেলে য়ুরি বা জ্যর্‌জ লণ্ডনের স্কুল-অভ-ওরিএণ্টাল স্টাডীস্‌-এ প'ড়তেন, য়ুরির আলোচ্য ছিল তিব্বতী আর সংস্কৃত। আমিও সেই স্কুলের ছাত্র ছিলুম; সেই সূত্রে য়ুরি র‍্যোরিখ-এর সঙ্গে ভাব হয়, পরে তিনি তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তাঁর বাপ মা আর ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে' দেন। এঁদের বাড়ীতে মাঝে-মাঝে যেতুম। এঁরা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ড থেকে লণ্ডনে আসতেই, তাঁর সঙ্গে র‍্যোরিখের পরিচয় করিয়ে' দেবার কর্তব্য সহজেই আমার উপর প'ড়ল। র‍্যোরিখ নিজে একদিন আমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে দেখ্‌তে এলেন—ছেলেরাও তাঁর সঙ্গে এল'; আমি কবিকে আগেই এঁর কথা ব'লে রেখেছিলুম। ইনি কবিকে নিজের আঁকা একখানি ছবি উপহার দিলেন, কবির একটী কবিতার রুষ ভাষায় অনুবাদ ("ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে…" এই কবিতাটী) প'ড়ে শুনিয়ে', ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—"এখন আপনার নিজের লেখা বুঝতে পারলেন?" দুজনে খুবই হৃদ্যতা জ'মে উঠ্‌ল। কবিও একদিন নিমন্ত্রিত হ'য়ে র‍্যোরিখের বাসায় গেলেন, র‍্যোরিখ-গৃহিণী খুব শ্রদ্ধা আর সম্মান-বোধের সঙ্গে কবিকে স্বাগত ক'র্‌লেন। এঁদের মধ্যে তার পরে

মাঝে-মাঝে দেখাসাক্ষাৎ হ'ত। আমি আমার পরিচিত সতীর্থ কতকগুলি ইংরেজ আর অন্য দেশীয় ইউরোপীয় ছাত্র, যারা কবির কাব্য প'ড়ে তাঁর অনুরাগী হ'য়েছে, তাদের বার-কতক কবির কাছে নিয়ে গিয়েছিলুম। কবি বেশ খুশী মনে দিলখোলা ভাবে এই বিদেশী তরুণদের সঙ্গে আলাপ ক'রেছিলেন; এই আলাপের স্মৃতি তাদের মনে নিশ্চয়ই চিরকাল ধ'রে জাগরূক থাক্‌বে। আমার মনেও এদের নিয়ে যাওয়া আর কবির সঙ্গে এদের কথাবার্তার অনেক কিছু এখনও উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। বেশি উৎসাহ দেখতুম কন্টিনেন্টাল ছাত্রদের মধ্যে। এখন এক দিনকার কথা বেশ মনে প'ড়্‌ছে। কবি কথায়-কথায়, বইয়ের মারফৎ বড় কবির কাব্য বা মহাপুরুষের বাণী ভবিষ্যৎ যুগের লোকেদের কাছে শোনানোর চেয়ে কোনও রকমে তাঁদের মুখের কথায় সেই বাণী তাদের "কানের ভিতর দিয়া মরমে" পৌঁছানোর বেশি উপযোগিতায় তাঁর বিশ্বাস আছে, এই মন্তব্য ক'র্‌লেন। তাতে এই মন্তব্য নিয়ে আলোচনা চ'ল্‌ল; সে কি ক'রে করা যায়? কবি ব'ল্‌লেন, কেন, গ্রামোফোন-রেকর্ডে ক'রে; এই ব'লে এই idea বা ভাবটী তিনি একটু ফালাও ক'রে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন,—"দেখ হে, ভবিষ্যতে হয়তো লাইব্রেরিতে বইয়ের বদলে, আজকালকার যুগের পরের যুগের কবি আর লেখকদের মুখের কথা, তাদের বক্তৃতা বা পাঠের রেকর্ড তৈরি ক'রে রাখতে হবে। কেউ লাইব্রেরিতে গিয়ে বই প'ড়বে না; রেকর্ড বার ক'রে বাজাবে, আর মনীষী আর কবিদের শিক্ষা, চিন্তা আর অনুভূতি বা সৌন্দর্য-দর্শনের কথা তারা কানে শুনে ধ'রতে পারবে—এইভাবে সোজাসুজি কবির বা দর্শনশীল ব্যক্তির মুখের কথা আমাদের উত্তরপুরুষদের কানের ভিতরে যাবে।" তাতে একটী ইটালীয় ছেলে ব'ললে, আচ্ছা তা হ'লে লাইব্রেরিতে এক-সঙ্গে পাঁচ-শ' লোক যদি পাঁচ-শ-খানা রেকর্ড বার ক'রে "পড়তে" আরম্ভ করে, তা হ'লে নানা ভাষায় পাঁচ-শ' গলায় একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হবে না? কবি তা শুনে হেসে তৎক্ষণাৎ উত্তর

দিলেন, "তা হবে কেন? রেল-স্টেশনে যেমন বাহিরের আওয়াজ বাঁচাবার জন্য টেলিফোনের কাচ-দিয়ে-ঘেরা ঘর থাকে, সেই ধরণের ঘর প্রত্যেক 'পাঠক' অর্থাৎ শ্রোতার জন্য হবে, তাতে সকলে নিশ্চিন্ত মনে বাণী শুনতে পারবে।" এই রকম কত বিষয়ের অবতারণা ক'রতেন, আবার সে সবের সমাধান ক'রতেন। প্রত্যেক বার-ই এই সব ছাত্র ছাত্রী যারা আমার সঙ্গে কবির কাছে যেত, সকলেই মুগ্ধ হ'য়ে ফিরে আসত।

এখন আমার মনে আফসোস হয়, কেন কবির সঙ্গে কথাবার্তার খুঁটিনাটিতে পূর্ণ রোজ-নামচা তখন রাখি নি, তা হ'লে হয়তো তাঁর অনেক ক্ষণিকের উক্তি, ক্ষণপ্রভার মত উঁকি দিয়ে চ'লে গিয়েছে, তা ধ'রে রাখতে পারা যেত। কিন্তু হায়, রবীন্দ্রনাথের মত লোকোত্তর প্রতিভাকে, তার সমস্ত শক্তি আর প্রকাশভঙ্গী সমেত কে লোক-সমক্ষে সম্পূর্ণ ধ'রে দিতে পারে? তিনি নিজে যা দিয়ে গিয়েছেন, তাঁর ব্যক্তিত্বের তাঁর বিভূতির যে অংশ তিনি স্বয়ং প্রকাশ ক'রে গিয়েছেন, তারই প্রাচুর্য আর নানামুখিতা এক বিস্ময়কর বস্তু; কেবল তারই পূর্ণ সমাদর ক'রতে, তার গৌরব থেকে প্রসাদ লাভ ক'রতে, আর তা থেকে নিজেদের আত্মসংস্কৃতি আনতে আমরা যেন সমর্থ হই॥

শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪৮

রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধ

রবীন্দ্রনাথের মুখেই ঘটনাটি শুনেছিলাম! কবি যেবার কানাডা হয়ে আমেরিকা যান—এবং ফেরার পথে জাপান ঘুরে ভারতবর্ষে আসেন। সেই ভ্রমণের সময়েরই একটি ঘটনা। সেবারের ভ্রমণে তাঁর সঙ্গী ছিলেন সম্ভবতঃ প্রিয়বর শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ। পশ্চিম কানাডা থেকে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় প্রবেশ করলেন। এই সময় আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলে এশিয়ার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে এক চরম বর্ণবিদ্বেষের ভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। কালিফোর্নিয়ার ফুল, ফল, শাক, সব্জী প্রভৃতি চাষবাসের কাজে আমেরিকা প্রবাসী চীনা, জাপানী ও ভারতীয়রা বেশ সাফল্যের সঙ্গেই অর্থোপার্জন করত। এদের মধ্যে ভারতবাসীদের সংখ্যাই ছিল বেশী। নিদারুণ পরিশ্রমের বিনিময়ে ভারতীয়রা যে উপার্জন করতেন—অনেক বিত্তহীন আমেরিকান তা সহ্য করতে পারতেন না। অন্য কোন উপায় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত এই সব আমেরিকানরা নানাভাবে ভারতীয়দের বিপর্যস্ত ও নিগ্রহ করবার চেষ্টা করতে লাগল। অনেক ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য নিয়েও এরা ভারতীয়, চীনা, জাপানীদের জমি, জায়গা কেড়ে নিতে লাগল। অনেক ভারতবাসীই এর ফলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার কোন একটি স্টেশনে বিদেশ ভ্রমণের পথে নামলেন। সরকারী কর্মচারীরা রবীন্দ্রনাথের পাশপোর্ট ইত্যাদি পরীক্ষা করলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনি ভারতবাসী বুঝতে পেরে তাঁর সঙ্গে নিম্নপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা খুবই দুর্ব্যবহার করলেন। কবির সঙ্গের জিনিষপত্রও তারা (সরকারী কর্মচারীরা) খুলে ফেলতে উদ্যত হলেন! বিশ্ববরেণ্য কবি সভ্য জগতের সর্বত্র সমাদৃত হয়ে আমেরিকার এক ছোট স্টেশনে এইভাবে আদৃত হলেন! কবি কিন্তু কোন প্রতিবাদ না জানিয়ে জিনিষপত্র খুলে দেখাতে সম্মত হলেন। ইতিমধ্যে একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী কবিকে চিনতে পেরে নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের কবির সঙ্গে সংযত ব্যবহার করতে বলেন। তিনি ঐ সব কর্মচারী-

দের বলেন যে তারা যেন রবীন্দ্রনাথকে এভাবে বিরক্ত না করেন।

এরপর কাস্টমসের যে কর্মচারীটি কবির মালপত্র পরীক্ষা করে দেখতে চাচ্ছিলেন তিনি বলেন যে হেতু তিনি বড় কবি ও নামী লোক, এইজন্য তারা তাঁকে আর বিরক্ত করবেন না। অন্য কোন সাধারণ ভারতবাসী হলে তাঁকে ওরা রেহাই দিতেন না। রবীন্দ্রনাথ এই কথা শুনে অপমানিত বোধ করলেন এবং ক্ষোভের ও ক্রোধের সঙ্গে কবি বলেছিলেন—"আমি তোমাদের কোন রকম অনুগ্রহ চাইনা। আমার দেশের দীনতম লোকের সঙ্গেও তোমরা যেমন ব্যবহার কর—আমার ক্ষেত্রেও আমি তোমাদের কাছ থেকে সেই রকম ব্যবহারই আশা করি।" কবির তেজস্বিতা ও দেশাত্ম-বোধে ওখানকার অধিবাসীরা বিস্মিত হলেন। শেষ পর্য্যন্ত অন্যান্য সরকারী কর্মচারীরা কবির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কবি কোন কথা না বলে নিজের মনের ভাব প্রকাশ না করেই সেখান থেকে চলে গেলেন। বিশ্বকবি তাঁর নির্দিষ্ট হোটেলে গিয়ে উঠলেন কিন্তু বিদেশে এই ধরণের বর্ণবিদ্বেষ দেখে তাঁর মন খুবই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। কবি অপমানিত বোধ করলেন—তাঁর সঙ্গে ও তাঁর দেশবাসীর সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের এই ব্যবহার তাঁর মনে বিশেষ অশান্তির সৃষ্টি করেছিল। হোটেলে একজন শিখ ভদ্রলোক (প্রবাসী) স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। শিখ ভদ্রলোকটি নিজেদের দেশ-নায়ককে কাছে পেয়ে নিঃসঙ্কোচে তাঁর সমস্ত অভাব, অভিযোগের কথা বললেন। শিখ ভদ্রলোকটি জঙ্গল কেটে জমি তৈরী করে শাক, সব্জী চাষ করে কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করেন সবই কবিকে বুঝিয়ে বললেন। শিখ পরিবারটী চাষের জমিগুলি বহুদিনের জন্য ইজারা নিয়েছিলেন, এই আশায় যে ভবিষ্যতে তারা স্থায়ীভাবে আমেরিকায় বসবাসের অধিকার পাবেন এবং এই সব জমিও তাঁরা নিজেদের অধিকারে আনতে পারবেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাত হচ্ছে না—উপরন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী তাঁরা যে জমি চাষ করছেন

তা থেকেও তাঁরা ভারতীয় বলে বঞ্চিত হতে চলেছেন। এই সব অবস্থায় শিখ পরিবারটি খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়ে কবির কাছে সাহায্য ও পরামর্শের জন্য এসেছেন। তাঁরা আশা করছেন যে কবি ব্যক্তিগত প্রভাবের দ্বারা তাঁদের এই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বললেন অন্য এমন কোন সৎ-ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করতে, যাতে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা আর তাদের বিরক্ত করতে পারবে না! কবি এই সব দেখে খুবই দুঃখ পেলেন এবং তাঁর বিতৃষ্ণাও হল। কবি ঠিক করলেন যে যখন তিনি এই সমস্যার সমাধানের জন্য কার্যকরীভাবে কিছুই করতে পারছেন না, তখন যে দেশে তাঁর স্বজাতিগণ নিগৃহীত হচ্ছে সেই দেশের সরকারের সম্মানিত অতিথিরূপেও তিনি থাকতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত বন্ধু, বান্ধব ও পরিচিতদের অনুরোধকে উপেক্ষা করে তিনি একটি জাপানী জাহাজে দেশে ফিরে এলেন। কবি এতই বিচলিত হয়েছিলেন যে বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা না করে (তিনি হয়ত ভেবেছিলেন যে বন্ধুরা তাঁকে হয়ত এখনই দেশে ফিরতে দেবেন না) নিজেই একটি জাপানী জাহাজ কোম্পানীতে যেয়ে দুই তিন দিনের মধ্যে দেশে ফেরবার ব্যবস্থা করে এলেন। আরও অনেক জায়গায় তাঁর যাবার ইচ্ছা ছিল সে সব পরিকল্পনাও তিনি পরিত্যাগ করেন।

গল্পভারতী বৈশাখ ১৩৬৭; 'পূর্ণিমা' শারদীয় সংকলন ১৩৫৩ প্রকাশিত রচনার সংশোধিত রূপ।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে

দ্বীপময় ভারতে

[১৯২৭]

কবির সঙ্গে আমরা ছিলুম তিনজন। ত্রিপুরার শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবশর্মা, শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র এবং অধুনা বিশ্বভারতী কলাভবনের অধ্যক্ষ; শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর, তখনকার বিশ্বভারতীর কলাভবনের অধ্যাপক; আর আমি। ক'লকাতা থেকে মঙ্গলবার ১২ই জুলাই, ১৯২৭ আমরা যাত্রা করি। আর জাহাজে চাপলুম বৃহস্পতিবার, ১৪ই তারিখে। এই মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি—তিন দিন ধ'রে একটানা রেল যাত্রা ক'রে আর মাদ্রাজে ঘোরাঘুরি ক'রে, জাহাজে যখন চ'ড়লুম তখন শরীর ও মন দুইই অবসন্ন। জাহাজ ছাড়তে সকলেই একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেললুম—অন্ততঃ চার পাঁচ দিন শুয়ে-ব'সে হাত-পা ছড়িয়ে যেতে পারা যাবে এই মনে ক'রে।

আমাদের জাহাজটি ছিল ফরাসী কোম্পানীর। নাম Ambois আঁবোআজ্। ফরাসী কোম্পানীর নাম মেসাঝেরি মারিতীম (Messageries Maritimes)। কোম্পানীর বড় কর্তা মসিও কোদিয়ার (M. Caudiere) স্বয়ং এসেছিলেন কলম্বোর হেড অফিস থেকে কবির সংবর্ধনা ক'রতে। তিনি, মাদ্রাজ অফিসের কর্তা মসিও ঝোবার (M. Jobard), আর জাহাজের কঁমাঁদা বা কাপ্তেন মসিও গাব্রিয়ার্গ (M. Gabrillargues) কবির সংবর্ধনা ক'রে জাহাজে স্বাগতঃ করলেন। আমাদের ছিল প্রথম শ্রেণীর টিকিট, কিন্তু জাহাজ-কোম্পানী বিশেষ ক'রে প্রথম শ্রেণীর উপরে যে 'কাবীন্-দ্য-ল্যুক্স্' আছে তাতে কবির থাকবার ব্যবস্থা করেছিল। জাহাজে উঠে, প্রথম শ্রেণীর পাঠাগারে কবি যাতে ব'সে আলাপ ক'রতে পারেন, তার ব্যবস্থাও করা ছিল।

কবিকে মোটরে ক'রে নিয়ে শ্রীযুক্ত রামস্বামী এলেন জাহাজ-ঘাটায়। মাদ্রাজে এলেই কবি শ্রীযুক্ত রামস্বামীর আতিথ্য স্বীকার করতেন। শ্রীরামস্বামী ছিলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের একজন প্রথিত-নামা উকিল। এবারেও আমরা তাঁর মৈলাপুরের বাড়ীতে উঠে-ছিলুম। ভদ্রলোকের স্বল্প পরিচয় থেকেও বড়ো প্রীত হয়ে-

ছিলুম আমরা। অতি মৃদুভাষী লোক, মোটেই নিজেকে কবির সামনে জাহির ক'রতে চান না, অথচ সর্বদাই তাঁর অতিথিদের সেবার জন্য হাজির। কবির সঙ্গে নানান্ রকমের লোক সদাসর্বদা দেখা করতে আসছে—ইনি বিশেষ সঙ্কুচিত—এদিকে যাতে কবিকে বিরক্ত না করা হয়, আবার ওদিকে দর্শনাথী লোকেরা যাতে মনে না করে যে কবি তাঁর অতিথি ব'লে তিনি কবির সঙ্গে একত্র অবস্থিতির সুযোগ পেয়ে তাঁকে একান্ত অধিকার ক'রে আছেন। আমরা ভালো দিনেই শ্রীযুক্ত রামস্বামীর গৃহে অতিথি হ'য়েছিলুম। তাঁর বাড়ীতে এক বিবাহ উৎসব ছিল, তাঁর এক পিস্তুতো ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে। বিয়ে হয়ে গিয়েছে তিনদিন পূর্বে; বৃহস্পতিবার যেদিন সকালে আময়া পেঁছিলুম সেটী ছিল বিবাহ উৎসবের চতুর্থ এবং শেষ দিন;—চার দিন ধ'রে আমোদ-অনুষ্ঠান, কুটুম্বভোজন ইত্যাদি চলে। গৃহস্বামী নিজে নিষ্ঠাবান্ তামিল ব্রাহ্মণ-ঘরের কর্তা হয়েও আমাদের আহারপর্বের জন্যে দু'তিনটে মাছ-মাংসের ভোজ্য-সামগ্রীর ব্যবস্থা করেছিলেন। নিজে সেগুলি স্পর্শ করেননি। কবির শরীর অসুস্থ ছিল। তিনি খালি একটু দই দিয়ে দুটি ভাত খেলেন।

বিকালে শ্রীরামস্বামীই জাহাজে তুলে দিতে এসেছিলেন। কবির অনুগত ভৃত্য বনমালী কবির সঙ্গে মাদ্রাজ পর্যন্ত এসেছিল। কবির জন্যে নির্দিষ্ট কেবিনে গিয়ে দেখলুম তাঁর বসবার ঘরে একরাশ পদ্মফুল দেওয়া হয়েছে। কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের এই সুন্দর উপায়টি দেখে আমরা সকলেই খুবই খুশী হয়েছিলুম।

বেশ মনে আছে, আমাদের জাহাজখানা ছিল বেশ বড়-সড়। পনেরো হাজার টনের জাহাজ। এতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীর সব মিলে প্রায় পাঁচ-শ' যাত্রী যাবার ব্যবস্থা ছিল। এ' ছাড়াও খোলা ডেক আছে দুটী। তাতেও যাত্রী ছিল ভর্তি। হরেক রকম জা'তের হরেক রকম মানুষের সমাবেশ। ফরাসী ত আছেই; তা ছাড়া ভারতবাসী, অনামী, আরব কেউ আল্-

জ্জাইর বা আল্‌জিরিয়ার লোক, জনাকয়েক কাফরী আর দু-পাঁচজন চীনা।

মার্সেয় (Marseilles) থেকে জাহাজটা আস্‌ছিল, যাবে তোঙ্‌-কিঙের হাইফঙ্‌ বন্দর—মস্ত লম্বা পাড়ি। পথে তার প্রথম থামা সিংগাপুর—সেখানে আমাদের নামিয়ে দেবে। জাহাজে বোধকরি আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল একটি রঙ-ফরসা ফরাসী ফিরিঙ্গি Creole 'ক্রেওল' জাতীয় ছেলের সঙ্গে। সত্যি ব'লতে কি, সেই আমাদের সঙ্গে পরিচয় ক'রলে। আমরা কেবিনে জিনিসপত্র বাক্সটাক্স নাড়ানাড়ি ক'রছি, এমন সময় সেই কেবিনে ঢুকে সেলাম ঠুকে একগাল হেসে স্বাগত ক'রে ফরাসীতে ব'ল্‌লে—'নমস্কার। আপনারা তো তিনজন এই দুই কেবিনে থাকবেন? আমি হচ্ছি আপনাদের কেবিনের চাকর আর খানসামা। যখনি কিছু দরকার হবে, কেবিনঘরের কোণের বিজলী-ঘণ্টার বোতাম টিপ্‌বেন, আওয়াজ পেলেই হাজির হবো।' ছেলেটির নাম মার্সেল (Marcel) বাড়ী মাদাগাস্কারে। ঘণ্টা টিপলেই আস্‌ত বলে কবি এর একটি নাম দিয়েছিলেন। তিনি তাকে ব'লতেন 'ঘণ্টাকর্ণ'—যে ঘণ্টাকে আকর্ণ করে বা শোনে। মার্সেলের বদলে মাঝে মাঝে একটি আহ্লাদী পুতুলের মত মুখ আমাদের কাছে দেখা দিত। তার কথা আমার বেশ মনে আছে। তার নাম ছিল লুইজ্‌ (Louise)। একটি প্রৌঢ়, খুব মোটাসোটা ঠান্‌দিদি-গোছের স্ত্রীলোক। চোখে উজ্জ্বল স্নেহমাখা দৃষ্টি। খাঁটি ফরাসী মানুষ। কবিকে দেখে তার ভারি ভক্তি হয়েছিল। প্রায়ই ব'লত ঃ 'কি চমৎকার চেহারা! ঠিক যেন হিব্রু ঋষি মোশেহ্‌! কি মহদ্‌ভাব-ব্যঞ্জক কপাল, চোখ, মুখ!'

জাহাজ ছেড়ে যাবার আগের দিন দুপুরবেলা খাবার টেবিলে বসেছি। অন্যদিনের মতই হাস্যালাপ ক'রতে ক'রতে মধ্যাহ্ন-ভোজন চলছে। খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। প্রধান খানসামাটি ফরাসী, রোজ খাবার সময় একবার ক'রে ঘু'রে যায়, আর বিশেষ ক'রে

বহুবার আমাদের টেবিলে আসে ; সে এসে কবিকে সেলাম ক'রে একখানা বেতার টেলিগ্রাম কবির হাতে দিল। কবি খুলে দেখে ব'ল্‌লেন যে সেটি একটি নিমন্ত্রণপত্র। ব্রিটিশ মালয়ের গভর্ণর তাঁর বাড়ীতে আতিথ্যস্বীকার ক'রতে অনুরোধ করেছেন।

আগে ঠিক ছিল আমরা সবাই শ্রীযুক্ত **Namazi** মোহম্মদ আলী নামাজীর বাড়ী গিয়ে উঠ্‌বো। এখন ঠিক হ'ল, কবি যাবেন লাটের আতিথ্য স্বীকার ক'রতে—আমরা নামাজীর বাড়ীতে গিয়ে উঠবো।

সিঙ্গাপুরে এসে জাহাজ পেঁছুলো সকাল আটটার দিকে। সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হ'ল জাহাজের। বন্ধুবর আরিয়ম এসে জানালেন যে ব্রিটিশ-মালয়ের গভর্ণর স্যর হিউ ক্লিফড্‌ (**Sir Hugh Clifford**) লাটবাড়ীর গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন কবিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। সেখানে তিন দিন থাক্‌তে হবে। কবি কিন্তু এই সংবাদে খুশী হলেন ব'লে মনে হয়নি। কবিকে সংবর্ধনা জানাতে জাহাজ-ঘাটায় এসেছিলেন সিঙ্গাপুর মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি, শ্রীযুক্ত ফারার (**Mr. Farrar**) এবং লাট তরফের শ্রীযুক্ত ক্যাম্বেল (**Camplell**) আন্তজাতিক কবিসংবর্ধনামণ্ডলীর দ্বারা এখানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ভারতীয় ছিল, চীনা ছিল, ইউরোপীয় ছিল, মালাইও ছিল। নীচে একটা খোলা জায়গায় কবিকে একটি চেয়ারে বসিয়ে একটি তামিল ভদ্রলোক ইংরিজীতে তাঁকে স্বাগত জানালেন। মালা দেওয়া, উপস্থিত ভদ্রলোকদের বটন-হোলে ফুল দেওয়া, গোলাপ জল ছিটানো, গোলা চন্দন দেওয়া—কিছুই বাদ গেল না। এমনকি জেটীর সেই গোলমালের মধ্যেই এক তামিল ভদ্রমহিলা তাঁর দক্ষিণী বীণায় সুর তুলেছিলেন—বুঝি বা গানও ধরেছিলেন। কিন্তু কিছুই বোধ করি শোনা গেল না। কবি লাটভবনের গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। আমরা চ'ললুম শ্রীযুক্ত নামাজীর বাড়ী।

সিঙ্গাপুর শহর থেকে পূবে আট মাইল গেলে **Siglap**

সিগ্ল্যাপ বলে একটা চমৎকার জায়গা আছে। সমুদ্রের ধারে নানা রকম বনের ছায়ায়, সাদা বালির উপর তৈরী কতকগুলি বাগান বাড়ীর সারি। এরই একটি নামাজীর। সেখানে আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল। নামাজী মহাশয়েরা জাতিতে ইরানী, পারস্যদেশে এঁদের আদি বাড়ী। ঘরে এঁরা ফরাসী বলেন, ধর্মে শিয়া-মুসলমান। বাল্যে নামাজী মহাশয় দেশ ছেড়ে ভারতে আসেন। মাদ্রাজে এঁর কারবার ছিল। সেখান থেকে সিংগাপুরে এসে ব্যবসা ফলাও ক'রে জমিজিরেত বিষয়সম্পত্তি, রবার এস্টেট ক'রে, স্থায়ী বসবাস করছিলেন।

সিঙ্গাপুরে দ্বিতীয় দিনে বিকেলবেলা সেখানকার চীনা শিক্ষিত লোকেরা আর ধনী ব্যবসায়ীরা, **Singapore Garden Club** নামে তাঁদের বড় সংস্থার তরফ থেকে কবির জন্যে একটি চা-পানের মজলিস আহবান করেন। এই মজলিসে চীনা ছাড়াও বহু বিশিষ্ট ভারতবাসীও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই সভায় কবি চীনের সঙ্গে ভারতের যোগ আর বিশ্বভারতীর সম্বন্ধে কিছু বলেন। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় চীনাভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় আবশ্যকতার কথাও তিনি এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। এই সভায় সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত ব্যারিস্টার **Song Ong-Siang** সোঙ-ওঙ-সিয়াঙ-এর সঙ্গে কবির আলাপ হয়। ইনি মালাই দেশের, বিশেষ করে সিঙ্গাপুরের চীনাদের পূর্বকথা নিয়ে আলোচনা পুস্তক **One Hundred Years' History of the Chinese in Singapore** গ্রন্থটির রচয়িতা। কবির পূর্ব-পরিচিত চীনের বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত **Dr. Lim Boon Keng** লিম-বুন্-কেঙ-এর সঙ্গেও এই সভায় কবির সাক্ষাৎ ঘটে। ডাক্তার কেঙ-এর সঙ্গে কবির প্রথম পরিচয় হয় গতবার চীন-ভ্রমণের সময়। এতদিন পর আবার সাক্ষাৎ হওয়ায় উভয়েই বিশেষ আনন্দিত হলেন।

পরের দিন শুক্রবার সিঙ্গাপুর শহরের টাউন-হলে, ভিক্টোরিয়া থিয়েটারে, একটি সভায় কবিকে নিয়ে এলেন স্যর হিউ ক্লিফোর্ড

সাহেব। সমস্ত সিঙ্গাপুর শহর যেন ভেঙে পড়েছিল, কবির বক্তৃতা শোনবার জন্যে। সেদিনের সভায় ইউরোপীয় এসেছিল প্রচুর। ভারতবাসী আর চীনার সংখ্যাও ছিল বহু। ক্লিফোর্ড সাহেবের স্বাগত-ভাষণের উত্তরে কবি বিশ্বভারতীর সহানুভূতিপূর্ণ জ্ঞানের আদর্শ, আর স্বার্থের সংঘাতে ক্লিষ্ট পরস্পর-বিরোধী জাতির জীবনে শান্তি আনবার জন্যে সেই আদর্শের উপযোগিতার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

সিঙ্গাপুরের ভারতীয়েরা কবিকে সিগ্‌লাপে শ্রীযুক্ত নামাজীর বাড়ীতে সংবর্ধনা জানাতে এলেন তার পরদিন বৈকালে।

পরদিন রবিবার। এ দিনে ছিল তিনটি অনুষ্ঠান। বেলা দুটোর সময়ে **Palace Gay Theatre**-এ চীনা শিক্ষক আর ছাত্রদের কাছে কবির বক্তৃতা। চারটেয় সিঙ্গাপুরের সব জাতের লোক মিলিয়ে যে **International Fellowship** বা আন্তর্জাতিক সম্মেলন গ'ড়ে তোলা হয়েছিল, তার-ই এক সভায় কবির সংবর্ধনা; আর তৃতীয় হচ্ছে সিঙ্গাপুরে ভারতীয়দের এক সভায় কবির উপস্থিতি।

প্রথমটিকে স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্র চীনাদের মেলা ব'লতেই হয়। কবির সঙ্গে আমাদেরও মঞ্চে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। চীনদেশের কনসাল ছিলেন সভাপতি। তিনি চীনাভাষায় কবিকে স্বাগত করলেন। তাঁর খাস-মুনশী তারপরে উঠে তাঁর বক্তৃতা ইংরিজীতে তর্জমা করে দিলেন। কবি তাঁর বক্তৃতায় ব'ল্‌লেন যে, মানুষ যে দেশে বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জন্মায় সে তার জন্ম-সূত্রেই সেই ক্ষেত্রের সমস্ত অতীতের, সমস্ত ইতিহাসের, সহজ অধিকারী হ'য়ে থাকে। ক'লকাতার একটি কোণে জন্ম নিয়ে কবি তেমনি ভারতের সমস্ত কৃতিত্বের উত্তরাধিকারী হয়েছেন। তেমনি তাঁর চীনা বন্ধুগণও চীনা সভ্যতার জগতের শ্রেষ্ঠ অধিকার পেয়েছেন। ভারতের এই যে প্রাচীন ইতিহাস আর সংস্কৃতি তার সঙ্গে চীনের বেশ একটু যোগ আছে। কবির ভারতীয় পূর্বজগণ চীনে যে আধ্যাত্মিক অভিযান

করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'র চলেছেন। এশিয়া-খণ্ডের এই দুই বিশাল জাতির মধ্যে যাতে পুনরায় ভাবের আদান-প্রদান আরম্ভ হয়, সে বিষয়ে আন্তরিক কামনা জানিয়ে কবি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। বিকালে আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র-সংবর্ধনা সমিতির যে সভ্যেরা কবির সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তাঁদের মধ্যে ভারতীয়, চীনা, ইউরোপীয়, মালাই জা'তেরই লোক ছিল। সন্ধ্যায় ভারতীয়দের জনসভায় কবির ভাষণটির হিন্দী অনুবাদ আমাকেই প'ড়তে হয়েছিল। শ্রীযুক্ত কুপ্পুস্বামী অয়্যর বলে এক তমিল ভদ্রলোক সেটিকে তমিলে অনুবাদ ক'রে শোনান। সেদিনের ভারতীয় জনসভায় যারা ছিল তারা অত্যন্ত সাধারণ লোক—ছোটখাটো দোকানদার ব্যবসায়ী, মোটর গাড়ীর শোফার, দরওয়ান প্রভৃতি—শিখ, পাঠান, পাঞ্জাবী মুসলমান, তমিল হিন্দু কুলি, ভোজপুরে, তেলেগু ইত্যাদি। দেশ ছেড়ে অনেক দূরে স্বদেশের এক মহাপুরুষকে দেখবার, বুঝুক না বুঝুক তাঁর মুখের দুটো কথা শোনবার যে গভীর আগ্রহ ও আকুলতা তাদের চোখেমুখে সেদিন আমি দেখেছিলুম, সে কথা আজও আমার মনে আছে।

পরদিন অর্থাৎ সোমবার বিকেলে সিঙ্গাপুরে স'ব জাতের ছাত্র আর শিক্ষকদের কাছে কবির বক্তৃতার কথা ছিল। এর ব্যবস্থা হয়েছিল সেই ভিক্টোরিয়া থিয়েটারে। এই সভায় সভাপতি ছিলেন কলোনিয়েল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ই-সি-এম উল্‌ফ (Wolf)। এই বক্তৃতায়ও খুব ভীড় হয়েছিল। আর কবি বলেছিলেনও ভারি সুন্দর। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা আর তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর বক্তব্য-বিষয়। কবির বক্তৃতাটি পুরো রিপোর্ট নেওয়া হয়েছিল এবং মালয়ের কতগুলি পত্রিকাতে বক্তৃতাটি প্রকাশিত হয়েছিল ব'লে জানি।

সেদিন ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল শ্রীযুক্ত ক্যাশিন (Cashin) বলে স্থানীয় এক ইউরেশীয় ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে। গৃহস্বামিনী খুব

সুন্দরী মহিলা, উচ্চ-শিক্ষিতা, এবং সবচেয়ে বড় কথা কবির এক-জন ভক্ত পাঠিকা। সে রাত্রির অন্যান্য অভ্যাগতদের মধ্যে ছিলেন ফরাসী ও ইতালীয় কনসাল। ফরাসী কনসালের স্ত্রী রুষ-জাতীয়া। তিনি রুষ ও ফরাসী তর্জমায় কবির লেখা কিছু-কিছু পড়েছেন ব'ললেন। সেদিন মিস্টার ক্যাশিন কবিকে বিশ্বভারতীর জন্যে এক হাজার ডলারের একটি চেক নমস্কারী দিয়েছিলেন।

সিঙ্গাপুর-প্রবাসের শেষ দিন 'মালয়া ট্রিবিউন' ব'লে এক ইংরিজী খবরের কাগজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গ্রানভিল্ রবার্টস বলে এক ইংরেজ, সিঙ্গাপুর আন্তর্জাতিক সম্মিলনীর তরফ থেকে তার বাসায় আমাদের লাঞ্চ অর্থাৎ দুপুরের খাওয়া খাওয়ায়। লাঞ্চে সস্ত্রীক জার্মান কনসাল ও ফরাসী কনসাল এবং দু'একজন ইউ-রোপীয়, চীনা আর মাদ্রাজী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। জার্মানী-ভ্রমণের সময়ে কবির সঙ্গে জার্মান কনসাল মহাশয়ের পরিচয় হয়েছিল। এবারে পুনরায় সাক্ষাতে আলাপটা আরও গাঢ় হ'ল। রবার্টস লোকটির সঙ্গে পরিচয় কবির পক্ষে ভালো হয়নি। কেননা কবি সিঙ্গাপুর ত্যাগ করে যাওয়ার পরেই লোকটি কবির বিরুদ্ধে তার কাগজে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে। পরে অবশ্য কারও সমর্থন না পেয়ে এই আক্রমণ আপনিই থেমে যায়।

বিকেলে আমরা 'লারুৎ' (**Larut**) জাহাজে চেপে চ'ললুম মালাক্কার পথে। এটা প্রায় বারো ঘণ্টার উপর পথ। জাহাজ-ঘাটায় বিদায় দিতে এসেছিলেন শ্রীযুক্ত নামাজী, চীনের কনসাল ও আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। এবার আমাদের নতুন সঙ্গী হলেন শ্রীযুক্ত ফ্যঙ-চ্যঃ-চেন (Feng Chih-Chen) নামে এক চীনা যুবক। যুবকটি সিঙ্গাপুরে শিক্ষিত চীনা-মহলে কবির বিষয়ে আর বিশ্বভারতী সম্বন্ধে আলাপ আলোচনায় আমাদের দোভাষীর কাজ করেন। আর তা ছাড়া আমাদের পাণ্ডারও কাজ করেন। ইনি এক চীনা ইস্কুলে ইংরিজীর শিক্ষক ছিলেন।

আমাদের জাহাজে, 'হজ' সেরে কতকগুলি ভারতীয় মুসলমান

যাত্রী ফিরছিলেন। তাঁদেরই একজন আমাকে জিগ্যেস করেছিলেন —"সাহব্, উও জো পীর-সা আদমী হ্মারে সাথ ইস জহাজ মেঁ চঢ়ে হৈঁ, রাবীন্দ্রনাথ টেগোর উ-হী হৈ, ন? বাহ, ক্যা নূরানী শক্‌ল্ (সায়েব, ঐ যে ঋষির মত মানুষটি আমাদের সঙ্গে এই জাহাজে চ'ড়ে যাচ্ছেন, উনিই কী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর? তাই না? আহা, কি জ্যোতির্ময় আকৃতি!)"

পরদিন সকালে জাহাজ এসে পৌঁছুলো মালাক্কা শহরের সামনে। নোঙর ফেলে দিলে। আমাদের স্বাগত জানাতে এলেন স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট—মিস্টার ডড্‌স্ (Dodds), আর মালাক্কার অধিবাসীদের তরফ থেকে সেখানকার একজন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ। সরকারী লঞ্চ শহরের একটি ঘাটে আমাদের হাজির ক'রলে। সেখানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মালাক্কায় আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল তাঞ্জঙ-ক্লিঙ-এ (Tanjong Kling) অবস্থিত শ্রীযুক্ত চান-কাঙ-সুই-এর (Chan-Kang-Swee) একটি মনোরম সুন্দর বাঙলা বাড়ীতে। শ্রীশবাবু ক'লকাতার কম্বুলেটোলার বিখ্যাত গুহ পরিবারের বংশধর। আরও যে কয়েকজন সদালাপী বাঙালীর সঙ্গে আমাদের সেখানে পরিচয় হয়েছিল তাঁরা হচ্ছেন—শ্রীযুক্ত বরেন্দ্র বসু শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দত্ত আর শ্রীযুক্ত সুধীর দাস।

এখানে প্রথম দিন দুপুরে মালাক্কা বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত ক্রাইটন (Crighton) সাহেবের সঙ্গে লাঞ্চ ছিল। এই আহারের আমন্ত্রণে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মালয়ের একজন রাজাও ছিলেন। বিকালে গভর্নমেণ্ট হাউসের বাগানে সান্ধ্য-চা-পান সভায় শহরের বিস্তর প্রধান ব্যক্তি এসেছিলেন। রাত্রে ডিনারের আয়োজন হয়েছিল রবীন্দ্র-সংবর্ধনা-সভার তরফ থেকে। ডিনারে সভাপতি ছিলেন মালাক্কার ম্যাজিষ্ট্রেট মিস্টার ডড্‌স্। ভোজনের পর বক্তৃতার পালা। কবির 'স্বাস্থ্যপান' করতে উঠে ডড্‌স্ সাহেব ব'ললেন যে মালাক্কাতে বিশ্ববিখ্যাত অনেকগুলি নামী ব্যক্তির পদার্পণ ঘটেছে।

কিন্তু বিশ্বমৈত্রীর বার্তাবাহী এমন কোন ভাবুক, কবি আর শিল্পী এদেশে কখনও আসেনি। বিশেষ করে মালাক্কার মতন দেশে যে বহু জা'ত মিলে একটা নতুন রাজ্য গড়ে তুলেছে সেখানে আন্ত-জাতিক চিন্তার বাণীবাহী ব্যক্তির পদার্পণের বিশেষ সার্থকতা আছে। কবি তাঁর হাস্যরসোজ্জ্বল ভাষণে বলেন যে, শাস্ত্রে বলেছেন যে 'ভুক্তা রাজবদাচরেৎ'—কিন্তু সে অনুশাসন তাঁকে ভঙ্গ ক'রতে হয় কিঞ্চিৎ নাচার হয়েই। তারপর তিনি বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলেন।

কবির আগমনে স্থানীয় তমিল চেট্টীদের মধ্যে খুবই উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। দলে দলে এঁরা আসতে লাগলেন কবি-সন্দর্শনে। সঙ্গে থালায় আর বারকোষে প্রচুর ফল, মিছরী আর এলাচ প্রভৃতি নিয়ে। মালাক্কা ত্যাগ করে যাবার আগের দিন বিকালে চীনাদের মহলে কবির অভিভাষণ ও সন্ধ্যায় স্থানীয় রোমান ক্যাথলিক ইস্কুল St. Francis Institution গৃহে কবির বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। সন্ধ্যার সভায় শ্রীক্রাইটন ছিলেন সভাপতি।

পরের দিন অর্থাৎ ৩০শে জুলাই বেলা দেড়টায় মোটরে ক'রে যাত্রা করা গেল তাম্পিন। সেখান থেকে মেন লাইনে ট্রেন ধরে যাওয়া হ'ল কুআলা-লুম্পুর (Kuala Lumpur)। কুআলা-লুম্পুরের পথে নেগরি-সেম্বিলান রাজ্যের রাজধানী সেরেম্বান পড়ে। এখানে আমাদের নামা হ'ল না। স্টেশনে বিস্তর লোকের সমাগম হ'য়েছিল। স্থানীয় বাঙ্গালী ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত এন-এস নন্দী মহাশয় আমাদের সঙ্গী হলেন। আবার এখানেই কুআলা-লুম্পুর থেকে সেখানকার লোকেদের প্রতিনিধি হয়ে শ্রীযুক্ত মনোজেন্দ্রনাথ মল্লিক ও একজন সিংহলী ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত বি. তালালা (B. Tallala) এলেন আমাদের অভ্যর্থনা ক'রতে। ক'ল-কাতায় মনোজবাবুর পিতার সঙ্গে কবির বিশেষ পরিচয় ছিল, তিনিও আগে থাকতেই কবির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সিংহলী ভদ্রলোক বৌদ্ধ, কুআলা-লুম্পুরের স্থায়ী বাসিন্দা, ভারতবর্ষ

মায় শান্তিনিকেতন ঘুরে এসেছেন।

সন্ধ্যার দিকে কুআলা-লুম্পুর পৌঁছনো গেল। এখানে স্টেশনে ভীড় খুব বেশী। সেই ভীড় ঠেলে এখানের স্বাগত-কারিণী সভার সভ্যরা কবিকে স্বাগত ক'রলে। এক মাদ্রাজী তমিল ভদ্রলোক কবিকে মাল্যদান ক'রতেই বিপুল আরাবে তমিল চেট্টী-মন্দিরের রোশন-চৌকীর বাদ্য বেজে উঠ্‌ল—শাঁখ, ঝাঁঝর, ঢোলক, মন্দিরা আর শানাই। ওঃ, সে কি কর্ণপটহ-বিদারণকারী শব্দ!

আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল চব্বিশ নম্বর ওয়েল্ড রোডে চ্যন-চুক-কী-লো (Chun-Chook-Kee-Lo) নামে ক্লাবে। স্থানীয় জন আষ্টেক অতিশয় ধনশালী চীনা বণিক্ আর বিষয়ী লোকেদের এই ক্লাবের স্থানীয় নাম (Millionaires' Club) বা 'দশ-লাখিয়া ক্লাব'। এই ক্লাবের বাড়ীটি তার চীনা চাকর-বাকর সমেত আমাদের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। রবীন্দ্র-সংবর্ধনায় স্থানীয় চীনারাও যে প্রাণ দিয়ে যোগ দিয়েছিলেন, এই ব্যাপারটা তার একটা বড় প্রমাণ।

পরদিন সকাল থেকেই কবি-দর্শনার্থীর ভীড়। বিকালে কুআলা-লুম্পুর মিউনিসিপালিটীর তরফ থেকে কবির অভিনন্দন, স্থানীয় টাউন হলে হ'ল। লোক সমাগম হয়েছিল খুব। এমন কি স্থানাভাবে অনেককে বিরস মনে ফেরৎ যেতে হয়। চীনা আর তমিল লোকই বেশী। কিছু পাঞ্জাবীও ছিল। সেলাঙর-রাজ্যের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত জে লর্‌নী (Lornie) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি, আর স্বাগত-কারিণী-সভার শ্রীযুক্ত লোক্ চাউথাই (Mr. Loke Chow-Thye) কবির প্রশস্তি ক'রলেন, কবিকে মাল্যদান ক'রলেন এবং রৌপ্যাধারে রক্ষিত মানপত্র উপহার দিলেন। কবি সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য ব'ললেন।

কয়দিন পরেই স্থানীয় ভারতীয় আর চীনারা মিলে এখানে বিশ্বভারতীর টাকা তোলবার জন্যে একটা বিচিত্রানুষ্ঠান Variety Entertainment-এর ব্যবস্থা করেন। অনুষ্ঠানটি হয় 'ড্রুরি লেন

থিয়েটার' নামীয় চীনা থিয়েটার হলে। কবি স্বয়ং এতে রাত্রে খাওয়ার পর এসে তাঁর ইংরিজী কবিতা গুটি পাঁচেক পাঠ ক'রে যান।

এই সময়ে এক ঘটনা ঘটে। গ্রানভিল রবার্টস (এর কথা উপরে আগেই বলেছি—সিঙ্গাপুর ত্যাগের দিন এই ভদ্রলোক কবিকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়েছিলেন) সম্পাদিত 'মালায়া ট্রিবিউন' কাগজে দোসরা অগস্ট অর্থাৎ আমরা কুআলা-লুম্পুর পেঁছিনোর একদিন পরেই এক সম্পাদকীয় বেরোল—'Dr. Tagore's Politics', তাতে অভিযোগ করা হ'ল যে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি 'শাংহাই টাইমস'-এ ইংরেজদের চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানোকে আর চীনদেশে ইংরেজ জাতের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের নিন্দা ক'রে এই হুমকিও নাকি দেখিয়েছেন যে, এশিয়ার লোকেরা ইউরোপের এই জঘন্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্যে প্রস্তুত হ'চ্ছে। এমনি অনেক কথা ব'লে সম্পাদকীয় স্তম্ভে কৈফিয়ৎ চাওয়া হয় যে, তিনি ব্রিটিশ-শাসিত মালাই দেশে সমাদর পাচ্ছেন, ইংরেজ রাজকর্মচারীর সহযোগিতা ও সহানুভূতি পাচ্ছেন কি ক'রে ? ঐ দিনের কাগজে 'শাংহাই টাইমস'-এর কাগজের প্রবন্ধ বলে কবির খানিকটা লেখাও তুলে দেওয়া হয়।

এখন আসল ব্যাপারটা হয়েছিল এই। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন চীন দেশে ভ্রমণ করেন, তখন চীনাদের উপরে ইংরেজ-নিয়োজিত ভারতীয় শিখ পাহারাওয়ালার অত্যাচার দেখে তিনি বড়ই ক্ষুব্ধ হ'ন। আর এই ঘটনা নিয়ে তিনি 'শূদ্রধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৩৩২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে বা'র হয়। এই প্রবন্ধটিই আবার ইংরিজীতে অনুবাদ ক'রে ১৯২৭ সালে মার্চ সংখ্যা Modern Review-তে ছাপা হয়। এই ইংরিজী প্রবন্ধটি নানা কাগজে ঘুরে শেষে 'শাংহাই টাইম্‌স্‌' কাগজে প্রকাশিত হয়। 'মালায়া ট্রিবিউন' সাংবাদিক সততা ও ন্যায়বুদ্ধির

পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে, প্রবন্ধটির বিকৃত অংশ-বিশেষ নিয়ে, কবির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ক'রতে শুরু করে।

'মালায়া ট্রিবিউন'-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধের কথা কবির কানে উঠ্‌তে, তিনি সিঙ্গাপুরের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠাবান্ সংবাদপত্রে কবির প্রবন্ধের বিকৃত অংশের প্রতিবাদ ক'রে একটি তার পাঠিয়ে দিতে ব'ল্‌লেন। 'মালায়া ট্রিবিউন'-কে কোনরূপ পাত্তাই দেওয়া হ'ল না। 'মালায়া ট্রিবিউন' দিন তিনেক ধ'রে এই নিয়ে অনেক লেখা-লেখি ক'রে এক সময়ে থাম্‌ল। দু'-একখানা ইংরেজ কাগজও এই ঘোঁটে যোগ দিয়েছিল। এখন 'মডার্ণ-রিভিউ'-এর প্রবন্ধের কথা আমাদের কারো মনে ছিল না। স্থানীয় এক তমিল কর্মচারী প্রবন্ধটি আমাদের গোচরে আনেন! সেটা প'ড়ে দেখা গেল যে 'that' কে বদলে 'and' করে, একটা সেমিকোলন লাগিয়ে', তারা 'মডার্ণ-রিভিউ'-এর প্রবন্ধের কোনো বাক্যের অর্থ উল্টে দিয়েছে। কুআলা-লুম্পুরের ভারতীয়দের সংবাদপত্র 'মালয়োন ডেলি এক্স-প্রেস' তাঁদের ৬ই অগস্ট তারিখের সংখ্যায় এই কথা খুলে লিখে দিলে। কিন্তু এদিকে কবিও চীনে ভারতীয়দের সৈন্য পাঠানোর বিরুদ্ধে তাঁর মতামত স্পষ্ট করে কাগজে জানিয়ে দিলেন।

সবচেয়ে লক্ষণীয় যে এই সব লেখালেখি সত্ত্বেও বেসরকারী ইংরেজ আর সরকারী ইংরেজ কর্মচারী কেউই একটুও বিচলিত হননি। স্থানীয় বিশিষ্ট ইংরেজরা, এই ঘৃণ্য কলম-বাজীর সঙ্গে ভদ্র ইংরেজের কোন যোগ নেই, একথা লিখে কবিকে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু দেশে অবশ্য এই ব্যাপারটা এত সহজে মেটেনি। দেশীয় কয়েকটি পাণ্ডা খবরটি এইরূপভাবে পরিবেশন ক'রলেন যে, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ লাটের আতিথ্যের লোভে তাঁর স্বাধীন মতামত বিসর্জন দিয়েছেন। ব্যাপারটা নিয়ে বাঙলাদেশের দুই-একজন গেঁয়ো মোড়লও মাতব্বরী করতে ছাড়েননি!

যাই হোক, আট দিনের দিন আমরা কুআলা-লুম্পুর ত্যাগ ক'রলাম। মাঝে রবীন্দ্রনাথ সেরেম্বান দেখে এসেছেন। কাজাঙ

ব'লে কুআলা-লম্পুরের দক্ষিণে একটি ছোট শহরে একটি বক্তৃতা সেরে এসেছেন। ক্লাঙ বলে একটি ছোট শহরও দেখে এসেছেন। কুআলা-লম্পুর থেকে আমরা Ipoh ইপোঃতে পেঁছিলুম। সেখানে Perak পেরাঃ বা পেরাকের রাজার বাড়ীতে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। রাজার তরফ থেকে তাঁর মন্ত্রী রাজা বন্দহারা স্টেশনে এসে কবিকে স্বাগত ক'রলেন।

এখানে কবি মালাই দেশের শিক্ষক-সম্মেলনে বক্তৃতা ক'রলেন। বিকালে টাউন-হলে নগরবাসীরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানালে। চীনা, মালাই—আর তমিল, সিংহলী, সিন্ধী, ভাটিয়া, শিখ, পাঞ্জাবী হিন্দু, এমন কী চার পাঁচজন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে এই সুযোগে আলাপ হয়েছিল সেখানে। ইপোঃ-র টাউন-হলে কবির বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিল! পেরাক রাজ্যের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট অনিবার্য কারণে সে সভায় সভাপতিত্ব ক'রতে পারেননি। সেখানকার প্রধান বিচারপতি সভাপতিত্ব করেন। এখান থেকে কবি তেলোঃ-আনসেন ব'লে একটি শহরে গেলেন, পেরার 'রাজা-মুদা' বা যুবরাজের তরফ থেকে একটি নিমন্ত্রণ রক্ষায়। যেখানে কবিকে যথারীতি অভিনন্দন-গ্রহণ আর বক্তৃতা-দান করতে হয়। ইপোঃ থেকে আরও একটি ছোট্ট শহর Tai-ping 'তাই-পিঙ্'-এ যাওয়া হ'ল। সেখানে একদিন থেকে Penang পেনাঙ। সর্বত্রই স্থানীয় ব্যক্তিরা কবির দর্শন-লাভের জন্যে ভীড় করে। সভা-সমিতি পূর্ববৎই চলতে থাকে। তবে পেনাঙ ছেড়ে আসবার আগের দিন স্থানীয় এম্পায়ার থিয়েটার হলে কবির যে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়, তার কথা ব'লতে হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পেনাঙের রেসিডেণ্ট কাউন্সিলার অনারেবল মিস্টার আর স্কট (Scott)। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'Nationalism'। এ বিষয়ে কবির যে নিজস্ব-স্পষ্ট মত আছে, তা স্বভাবত-ই সকল জাতির পক্ষে মুখরোচক হয়নি। কিন্তু কবি স্পষ্টভাষায় সে মতটুকু পুনরাবৃত্তি ক'রতে মোটেই দ্বিধা করলেন না। প্রসঙ্গতঃ জগতের শান্তির জন্য

আন্তর্জাতিক মনোভাবের আবশ্যকতা, আর এই কার্যে বিশ্ব-ভারতীয় সহায়তার কথা উল্লেখ ক'রলেন তিনি।

মঙ্গলবার, ১৬ই আগস্ট আমরা সুমাত্রা-গামী জাহাজে গিয়ে উঠলুম। (Blue Funnel Line) ব্লু-ফনেল-লাইন, ইংরেজ কোম্পানী। তাদের জাহাজের নাম Kuala 'কুআলা'। সারা রাত ধ'রে পাড়ি দিয়ে জাহাজ পরদিন ভোরে পৌঁছাল সুমাত্রা দ্বীপের বন্দর (Belawan) বেলাওয়ানে। ঘণ্টা পনেরো-ষোলোর পথ। এদিকে পেনাঙ, ওদিকে বেলাওয়ান। মাঝখানে সুমিত্রা প্রণালী। জাহাজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভ্রমণের প্রথম পর্ব শেষ হ'ল। যবদ্বীপের পথে মালাই দেশটা ঘোরা হ'ল।

বেলাওয়ানে আমাদের নূতন সঙ্গী হলেন পুরনো বন্ধু শ্রীযুক্ত আ-আ বাকে (Mr. A. A. Bake)। শ্রীযুক্ত বাকে হলাণ্ড দেশীয়। হলাণ্ডের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেখানে সংস্কৃত শিখতে শুরু করেন। সেখান থেকে সস্ত্রীক আসেন শান্তিনিকেতনে। যবদ্বীপ-যাত্রায় কবির সহযাত্রী হবেন এঁরা, এটাই ঠিক ছিল।

বেলাওয়ান আসলে এ অঞ্চলে সুমাত্রার প্রধান নগর বা সরকারী কেন্দ্র মেদান (Medan) বা মেদান-দেলি (Medan-Deli)-র বন্দর-মাত্র। মেদানের Hotel Deboer হোটেল দেবুর-এ আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল—যদিও থাকবার সময় ছিলো মাত্র কয়েক ঘণ্টা। হোটেল-দেবুর-এর ব্যবস্থা খুবই উঁচুদরের। বেলাওয়ানে কবিকে স্বাগত জানাতে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন, ডচ্ ভদ্রলোক ও মহিলা জনকতক ছাড়া, স্থানীয় থিওসফিস্টদের প্রতিনিধি, চেট্টিদের প্রতিনিধি, সিন্ধীদের প্রতিনিধি আর ইপোঃর বিখ্যাত টিন-খনির সিংহলী মালিক ডাক্তার (Rogers) রজার্স। এ'ছাড়া বহু দর্শন-প্রার্থী আমাদের হোটেলে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে গেলেন। বিকেল চারটায় আমরা বাতাভিয়াগামী ডচ্ জাহাজ প্লান্‌সিউস (Plancius) ধ'রে যাত্রা ক'রলুম। বিদায় দিতে জাহাজ-ঘাটায় বহু লোক এসেছিলেন। কবি এখানে পুরো একদিনও

রইলেন না ব'লে অনেকেই আক্ষেপ ক'রতে লাগলেন।

জাহাজ সিঙ্গাপুর একদিন থেমে ছিল। কবি Kelly and Walsh কোম্পানীর দোকানে গিয়ে খান কয়েক বই কিনলেন। আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানীর অফিসে দরকার ছিল—সেটুকুও সেরে নিলেন। তারপর শ্রীযুক্ত নামাজীর কন্যার কাছে প্রতিশ্রুত তাঁর নিজের একখানি বই তাঁদের অফিসে পোঁছে দিয়ে, জাহাজে ফিরে এলেন। নামাজীরা কেউ অফিসে ছিলেন না তখন। এঁরা পরে জাহাজ ছাড়বার আগে এসে কবির সঙ্গে দেখা ক'রে যান।

যবদ্বীপের পথে জাহাজে কবির বিখ্যাত কবিতা 'শ্রীবিজয়-লক্ষ্মী' লেখা হয়। কবিতাটি ১৩৩৪ সালের কার্তিক মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। কবিতাটির কিছুটা তুলে দিচ্ছি—

তোমায় আমায় মিল হয়েছে কোন্ যুগে এইখানে।
ভাষায় ভাষায় গাঁঠ পড়েছে, প্রাণের সঙ্গে প্রাণে।
ডাক পাঠালে আকাশ পথে, কোন্ সে পুবেন বায়ে,
দূর সাগরের উপকূলে, নারিকেলের ছায়ে।
গঙ্গাতীরের মন্দিরেতে সেদিন শঙ্খ বাজে,
তোমার বাণী এপার হ'তে মিল্‌লে তারি মাঝে।
বিষ্ণু আমায় কইলে কানে, ব'ললে দশভুজা,
"অজানা ঐ সিন্ধুতীরে নেবো আমার পূজা।"
মন্দাকিনীর কলধারা সেদিন ছলো-ছলো
পূব-সাগরে হাত বাড়িয়ে ব'ললে, "চলো, চলো"।
রামায়ণের কবি আমায় কইলে আকাশ হ'তে,
"আমার বাণী পার ক'রে দাও দূর সাগরের স্রোতে।"
তোমার ডাকে উতল হ'ল বেদব্যাসের ভাষা,
ব'ললে, "আমি ঐ পারেতে বাঁধবো নোতুন বাসা।"
আমার দেশের হৃদয় সেদিন কইলে আমার কানে,
"আমায় ব'য়ে যাওগো ল'য়ে সুদূর দেশের পানে।"

এই সুন্দর কবিতাটির ইংরিজী তর্জমা কবি নিজেই করেন। ডচ্

অনুবাদ করেন শ্রী বাকে। ইংরিজী তর্জমাটি পরে 'বিশ্বভারতী-ত্রৈমাসিকে' প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটির যবদ্বীপীয় অনুবাদও হয়েছিল, আর যবদ্বীপের একজন শ্রেষ্ঠ কবি তার উত্তরে নিজের ভাষায় একটি সুন্দর কবিতাও লেখেন।

বাতাবিয়ায় আমরা দুদিন ছিলাম। বাতাবিয়ার বন্দর তানজোঙ-প্রিয়োক-এ আমাদের জাহাজের সিঁড়ি লাগাতেই, কবিকে স্বাগত করবার জন্যে এলেন ডাক্তার Bosch বস্, ইনি ডচ্ সরকারের নিযুক্ত দ্বীপময়-ভারতের প্রত্ন-বিভাগের অধ্যক্ষ, আর ডাক্তার হুসেন জয়দিনিঙ্রাট্, ইনি এক যবদ্বীপীয় বিশিষ্ট বিদ্বান্। এঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের প'র সিন্ধীদের দ্বারা মাল্যদান, ফুলের তোড়া উপহার আর কবির পদধূলি গ্রহণের ধুম পড়ে গেল। চীনাদের সংস্থা 'চোঙ্ হোআ ক্বে ক্বান্' (Tjong-Hoa Kwe Kwan) থেকে কবিকে পুষ্পচক্র দেওয়া হয়। স্থানীয় ভারতবাসীদের সাজানো মোটরে না উঠে, সাধারণ একটা গাড়ীতে চ'ড়ে আমরা বন্দর থেকে ভেলটেফ্রেডেন (Weltevreden) অঞ্চলে যে হোটেলে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেখানে এসে উঠ্লুম। হোটেলটির নাম Hotel des Indes অর্থ 'ভারতের হোটেল'। হোটেলটির ফটকের দুপাশে দ্বারীর মত দুটি বিশাল 'ওয়ারিঙিন' (Waringin) গাছ ছিল—আমাদের বট-গাছের মতন। হোটেলে পোঁছবার পরেই বাতাবিয়ার ইংরেজ কনসাল মিস্টার ক্রসবি (Mr. Crossby) কবির সঙ্গে দেখা ক'রে গেলেন। ইনি রবীন্দ্রনাথের পরম অনুরাগী।

বাতাবিয়ায় আমাদের প্রথম সম্মেলনের ব্যবস্থা ক'রলেন 'কুন্স্টক্রিঙ' (Kunstkring)। এটি বাতাবিয়ার শিক্ষিত ডচেদের একটি সাহিত্য আর কলাচর্চার সমিতি। ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত কতকগুলি যবদ্বীপীয় ভদ্রলোকও এতে যোগ দিয়েছে। যবদ্বীপে আসবার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা যাঁরা আমন্ত্রণ করে-ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এই 'কুন্স্টক্রিঙ্' সমিতিটি প্রধান। এই

সমিতির আয়োজিত সান্ধ্য সম্মেলনে ডাক্তার বস্ আর ডাক্তার জয়দিনিঙ্রাট্ ছাড়াও ডাক্তার কাটস্ (Dr. T. Kats) বলে একজন বড় প্রত্নতত্ত্ববিৎ আর শ্রীযুক্ত পি-এ-জে মুন্ (Moen) নামে এক পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। মিস্টার ক্রসবি কবির সঙ্গে ডচ্ গভর্নর জেনারেলের দেখা করবার ব্যবস্থা করেন। ভারতীয়দের তরফ থেকে অভিনন্দন জানাবারও ব্যবস্থা করা হয়। যেদিন আমরা বাতাবিয়া ছেড়ে এলুম, তার আগের দিন রাত্রে মিস্টার ক্রসবি আমাদের তাঁর বাড়ীতে ভোজ খাওয়ালেন। ভোজের পর সভায় ক্রসবি সাহেব এক আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় কবির রচনা কী গভীরভাবে তাঁর জীবনকে অনুপ্রাণিত করেছে আর তাঁকে কী গভীর আনন্দ দিয়েছে, তা' সশ্রদ্ধহৃদয়ে উল্লেখ ক'রলেন। কবি এই সভায় তাঁর যবদ্বীপের উপর লেখা কবিতার ইংরিজী অনুবাদ—The Indian Pilgrim to Java পাঠ ক'রে শোনান। যাবার দিন স্থানীয় ভারতীয় বণিক্রা কবির সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কবি তাঁদের সঙ্গে বিশ্বভারতী আর বিশ্বভারতীর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের কোন্ বাণী তিনি প্রচার ক'রতে চান, আর বিদেশে এসে প্রবাসী ভারতীয়দের দায়িত্ব কী—সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এঁরা সকলেই বিশ্বভারতীকে সাহায্য ক'রতে স্বীকৃত হন।

আমাদের জাহাজটি ছোটো—K.M.P.-র জাহাজ। পথে সেমারাঙ (Semarang) আর সুরাবায়া (Soerabaja বা Surabaya) হ'য়ে ২৬শে অগস্ট, ১৯২৭ শুক্রবার আমরা বুলেলেঙ্ (Boeleleng) বন্দরে বলিদ্বীপের মাটিতে অবতরণ ক'রলুম। পথে যবদ্বীপের প্রধানতম ব্যবসায়-কেন্দ্র সুরাবায়ায় আমরা নেমেছিলুম। সেখানে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আমরা আবার জাহাজে এসে উঠেছিলুম। আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবার জন্যে বিশেষ করে এক ডচ্ ভদ্রলোক এসেছিলেন; এঁর নাম সামুএল কোপেয়ারবেয়ার্গ (Koperberg)।

ঠিক ছিল, বুলেলঙ থেকে মোটরে ক'রে আমরা বাঙ্লি (Bangli) যাবো। সেখানে স্থানীয় রাজার পিতৃব্যের শ্রাদ্ধবাসরে আমরাও হাজির হবো। সেইমতই আমরা Rani Patima 'রাণী পাতিমা'র মোটর ভাড়া করে যাত্রা সুরু করলুম। রাণী পাতিমা বুলেলঙ শহরের একজন প্রধানও বটেন। তিনি স্বয়ং এসে ইউ-রোপীয় কায়দায় আমাদের সকলের সঙ্গে করমর্দন ক'রলেন। তারপর সব ঠিক হ'লে, গাড়ী ছাড়বার সময় আমাদের বার বার 'সালামৎ জালান' (Selamat Djalan) বা শুভযাত্রা জানিয়ে বিদায় নিলেন।

বাঙলিতে যে উৎসবে যোগ দিতে গিয়েছিলুম, সেটি হ'চ্ছে বাঙলির রাজা, যাঁর উপাধি হচ্ছে 'পুঙ্গব' (Poenggawa), তাঁর এক পিতৃব্যের আদ্যশ্রাদ্ধ। বলিদ্বীপের ভাষায় তাকে বলে 'মেমুকুর' (Memukur)। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন—শ্রীযুক্ত লেওনার্ডস যোহানেস যাকোবস কারোন (Mr. Leonardus Johannes Jacobus Caron)। ইনি বলী আর লম্বক দ্বীপের ডচ্ রেসিডেণ্ট বা শাসনকর্তা। কারেঙ-আসেম নামে এক খণ্ড-রাজ্যের রাজা; আর এক খণ্ড-রাজ্য Gianjar গিয়াঞ্জার-এর জমীদার; উবুদ-এর 'পুঙ্গব' শ্রীযুক্ত গডে রাকে চকর্দে সুখবতী—এঁরা সকলে বাঙলির পুঙ্গবের নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রতে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথকে শ্রীযুক্ত কারোন খুবই সম্মানের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বলিদ্বীপের হ'য়ে তাঁকে তিনি স্বাগত জানালেন। রবীন্দ্রনাথ যে প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি দেখতে এসেছেন, তা শুনে তিনি খুব খুশী হলেন। উপরন্তু, তিনি আশা প্রকাশ ক'রলেন যে তাঁর আগমনে বলিদ্বীপে মনোহর হিন্দু সংস্কৃতি আরও সুদৃঢ় হবে। প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ ব'ল্লেন যে, আধুনিক ভারতবর্ষ আর বলিদ্বীপ পরস্পর নিজেদের মঙ্গলের জন্যে পরস্পরকে জানুক—তাঁর আসার মুখ্য উদ্দেশ্য তাই।

এইখানে একটি ছোট ঘটনা ঘটেছিল, সেটা বলা দরকার। রবীন্দ্রনাথ মোটরে করে যখন বাঙলিতে আস্‌ছিলেন, তখন তাঁকে দেখে মোটর-চালক পার্শ্ববর্তী কোপেয়ারবেয়ার্গকে জিজ্ঞাসা ক'রলে, ইনি কে? কোপেয়ারবেয়ার্গ মালাইয়ে বললেন—ইনি **Voor-India** বা **Hindoestan** থেকে আগত **Mahagoeroe** মহাগুরু। 'মহাগুরু' এই পরিচয়টি কথায় কথায় এসে গেলেও, এই উপযুক্ত শব্দটির দ্বারা কবি বলিদ্বীপে সাধারণতঃ পরিচিত বা অভিহিত হয়েছিলেন। বুলেলেঙ বন্দর থেকে আসবার পথে মোটর-চালক, যেখানেই দরকার হয়েছে, 'ভারতবর্ষ' থেকে আগত মহাগুরু' (**Mahogoeroe dari Boratawarsa**) নামেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দিয়েছেন। আর সেই পরিচয়ই—বোধকরি বলিদ্বীপবাসীদের মনে বেশ সার্থক বোধ হওয়ার জন্যে—সাধারণ্যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ বা অভিধা হ'য়ে গিয়েছিল।

সেদিনই আমরা বাঙলি থেকে কারেঙ্‌-আসেন (**Kareng-Arem**) খণ্ড-রাজ্যে চলে গেলাম। রাজার নাম শ্রীযুক্ত হিডা আনাকে আগুঙ্‌ বাগুস জলান্তিক (**Mr. Hida Anake Agoeng Bagoes Djelantik**)। বনেটে সোনার গরুড়-মূর্তিযুক্ত তাঁর মোটরে ক'রে রাজা কবিকে নিয়ে গেলেন। আমরা গেলুম পরে। কবি আর সুরেনবাবু রইলেন রাজপ্রসাদে। আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হ'ল কারেঙ-আসেমের **Pasanggrahan** 'পাসাংগ্রাহান' বা ডাক-বাংলায়। কবি রাজ-পুরীতে পদার্পণ ক'রতেই, স্থানীয় বলিদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা মিলে সুললিত মন্ত্রাদি পাঠ ক'রে কবিকে স্বাগত জানান। এখন কবি ছিলেন পথভ্রমণে বিশেষ ক্লান্ত। তিনি একটু নির্জন স্থানে একাকী বিশ্রাম ক'রতে চান। কিন্তু তাঁর ভাষা রাজার বোধগম্য করার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। মাঝে মোটরে আসতে-আসতে, রাজা সমুদ্র দেখে সমুদ্রের নানা সংস্কৃত প্রতিশব্দ কবিকে শুনিয়ে ছিলেন। কিন্তু কথাবার্তা চালানোর কোন ব্যবস্থা হয়নি। শেষে কে একজন বুদ্ধি ক'রে,

বাজারের গুজরাটী কাপড়ওয়ালার দোকানের একজন খোজা বানিয়াকে কথাবার্তা চালাবার জন্যে ধ'রে নিয়ে এল। তখন তার মারফৎ কবি রাজাকে অনুরোধ ক'রলেন যে অতিথিকে একলা থাকতে দিয়ে রাজা নিজেও যেন বিশ্রাম গ্রহণ করেন। রাজা তখনই সেইমত ব্যবস্থা ক'রলেন। কবি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। সেদিন রাত্রে বলিদ্বীপীয় নাচের ব্যবস্থা হ'ল কবির জন্যে রাজ-পুরীতে। আমরা ডাক-বাংলা থেকে গিয়ে দেখে এলুম। বাঙলিতে যেমন যাত্রা অভিনয় দেখেছিলুম, এটিও অনেকটা তেমনি। আখ্যানটা মহাভারত থেকে নেওয়া।

পরদিন রাজার বৈঠকখানায় কবিকে কতকগুলো প্রাচীন তাল-পাতার পুঁথি দেখালেন রাজা। রাজা অনুরোধ ক'রলেন, সেই পুঁথির বিষয়বস্তু 'মহাগুরু' তাদের ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিন। রাজার সংস্কৃত উচ্চারণ দুর্বোধ্য। আমি তাঁকে পুঁথিখানি রোমান অক্ষরে লিখে যেতে ব'ল্‌লুম। রোমান প্রত্যক্ষরীকরণ থেকে শ্লোকগুলি আমি আমাদের মতন ক'রে প'ড়ে যেতে লাগলুম, আর কবি সেগুলির ইংরিজী অনুবাদ ক'রে যেতে লাগলেন। আমাদের একজন ডচ্‌ বন্ধু ইংরিজী থেকে মালাই-এ তার অনুবাদ ক'রতে লাগ্‌লেন। রাজা সেগুলি লিখে নিতে লাগলেন। রাজা বোধকরি একটা সত্য বুঝতে পেরেছিলেন যে, সংস্কৃত না শিখ্‌লে নিজেদের ধর্ম আর সংস্কৃতি ভালো করে উপলব্ধি করা যাবে না। বলিদ্বীপে আবার সংস্কৃত-চর্চা শুরু করার উপায় সম্বন্ধে তিনি অনেকক্ষণ ধ'রে আলাপ করেছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের বলিদ্বীপে পাঠানোর ব্যাপারটা কবি চেষ্টা ক'রে দেখবেন ব'ললেন। বলিদ্বীপের কয়েকজন ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষে নিয়ে গিয়ে সংস্কৃত পড়ানোর কথাও আলোচনা করা গিয়েছিল। আর একটা জিনিস আমার নজরে পড়েছিল। রাজার বসবার ঘরে তাঁর পারিবারিক ছবির পাশেই কবিরও একটি ছবি টাঙানো ছিল।

এখানে কবির শরীর ভালো যাচ্ছিল না। ঠিক হ'ল কবি মধ্য-

বলিতে পাহাড়-অঞ্চলে **Tampak Sering** তাম্পাক-সেরিঙ ব'লে একটি অতি নির্জন আর ঠাণ্ডা জায়গায় থাকবেন। কারেঙ-আসেমে তাঁর আরও দুইদিন থাকবার কথা ছিল। কিন্তু শরীরের জন্যে বাধ্য হয়ে যে ভ্রমণসূচী বাতিল ক'রে, কবি তাম্পাক-সেরিঙ চ'লে গেলেন। সঙ্গে গেলেন সুরেনবাবু আর কোপ্যায়ারবার্গ সাহেব। সেখানে ডাক-বাঙলায় কবি উঠ্‌লেন। ডক্টর খোরিস (**Dr. Goris**) নামে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এক ডচ্‌ যুবকও, পরে কবির সঙ্গে যোগ দেন। তাম্পাক-সেরিঙের পার্বত্য নদীতে স্নানের স্থান বা ঘাট বিখ্যাত। সেখানকার 'প্যাসাঙগ্রাহানের' সামনে পাহাড়ে' নদীর জলধারাকে অবলম্বন করে যে স্নানাগার করা হয়েছে, সেটির নাম **Tirta Ampoel** 'তীর্তা বা তীর্থ আম্পুল'। এই স্নানাগার নিয়ে চিত্তাকর্ষক উপকথার প্রচলন আছে। ইতোমধ্যে গিয়াঞ্জারের রাজা এসে নিমন্ত্রণ ক'রে গিয়েছেন, তাঁর বাড়ীতে অন্ততঃ একদিনের জন্যে পদার্পণ ক'রতে। দিন-দুই এখানে বিশ্রাম ক'রে কবিও বেশ খানিকটা সুস্থ। আমরা ঠিক ক'রলুম, তাম্পাক-সেরিঙ থেকে গিয়াঞ্জার, এবং সেখান থেকে একেবারে (**Badoeng**) বাদুঙ বা (**Den-Pasar**) দেন্‌-পাসার শহরে যাত্রা ক'রবো।

গিয়াঞ্জারের রাজার পুরো নাম 'হিডা আনাকে আগুঙ্‌ ঙুরাঃ আগুঙ (**Hida Anake Agoeng Ngoeng Agoeng**)। রাজা নিজে এসে আমাদের স্বাগত জানালেন। তাঁর প্রাসাদের বহি-র্বাটীতে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। স্থানীয় ডচ্‌ কণ্ট্রোলার শ্রীযুক্ত বুর্স্‌মা (**Mr. Boersma**) কবিকে দেখাবার জন্য গিয়াঞ্জারের রাজবাটীতে সন্ধ্যায় যাত্রার আয়োজন করিয়ে-ছিলেন। মুখস পরে নাটকের অভিনয় হয়েছিল। এই নাচের নাম 'তোপেঙ' **Topeng**। নাটক চ'লতে-চ'লতেই আহারের ডাক এল'। আহারের মধ্যে আমাদের তরফ থেকে রাজাকে ধন্যবাদ দিয়ে মালাই ভাষায় একটি বক্তৃতা দেওয়া হ'ল। রাজা তার উত্তরে

ব'ললেন যে, বলিদ্বীপীয় আর ভারতের লোকেরা একই বংশের ; ভারতের সঙ্গে এই সংযোগ তাঁদের কাছে গৌরবের বস্তু। কবিকে এর উত্তরে কিছু ব'লতে বলা হ'লে, তিনি ব'ললেন যে, পিতৃ-পুরুষদের ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধের জন্যেই তাঁর দ্বীপময়-ভারত ভ্রমণ ; যে প্রাচীন ভারত এই সমস্ত দূর দেশকে একান্ত আপনার ক'রে তুলেছিল, সেই ভারতের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্যে, আর সেই ভারতকে বোঝাবার জন্য—আর সেই সংস্কৃতিকে আবার এদেশে আর ভারতবর্ষে সুদৃঢ় ক'রে তোলবার জন্যেই, তাঁর এদেশে আগমন।

গিয়াঞ্চার থেকে আমরা পরে বাদুঙ-এ চ'লে এলুম। এখানে ফিদা হোসেন ব'লে একজন গুজরাটী মুসলমান ব্যবসায়ী আমাদের খুবই সাহায্য করেছিলেন। আমরা বাদুঙ-এর ডাক-বাংলায় উঠেছিলুম।

বাদুঙ থেকে আমরা Oeboed 'উবুদ' গ্রামে স্থানীয় 'পুঙ্গব' বা জমীদার, গডে রাকে চকর্দে সুখবতীর (Gade Rake Tjo-korde Soekawati) বাড়ীতে গেলুম। এঁর বাড়ীতেও একটি শ্রাদ্ধপর্ব চ'লছিল। জমীদারটি বেশ প্রভাবশালী ব্যক্তি। বেশ যত্নের সঙ্গে আমাদের গ্রহণ ক'রলেন। এঁর সঙ্গে পূর্বেই আমাদের বাঙলির শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে সাক্ষাৎ হয়েছিল। এখানে বেশ একটা লক্ষণীয় ব্যাপার ঘটেছিল। আমি ব্রাহ্মণ জেনে, এবং ভারতবর্ষ থেকে আগত 'পদণ্ড' বা 'দণ্ডধারী' পুরোহিত ভেবে, সুখবতী আমাকে তাঁর আত্মীয়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে কিছু বেদ প'ড়তে অনুরোধ ক'রলেন। কবিকে সে কথা ব'লতে, তিনিও আমাকে সানন্দে রাজী হ'তে ব'ললেন। কবিও একদিন উবুদের শ্রাদ্ধ-সভা ঘুরে গেলেন। সেখানে গৃহস্বামী সুন্দর সুখবতী কবিকে স্বাগত ক'রলেন। এখন নির্ধারিত দিনে আমি কঠোপনিষদের গোটা দুই বল্লী, গীতার দ্বিতীয় আর একাদশ অধ্যায়, আর শেষে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের কতকগুলি ঋক্ পড়লুম। এদের পদণ্ডেরা যে

উচ্চমঞ্চে ব'সে পূজা-পাঠ ক'রছিলেন, সেই মঞ্চের উপর ধুতিচাদর প'রে ব'সে আমিও পাঠ ক'রলুম। সুখবতী তো খুব খুশী। আমাকে পুরোহিতের দক্ষিণা-হিসাবে ঐ দেশীয় প্রথা অনুযায়ী ধোত্র উষ্ণীষ ও উত্তরীয় ও আর কয়েকটা জিনিস উপহার দিলেন। আমি ডান হাতে স্পর্শ ক'রে সেগুলি গ্রহণ করলুম।

বাইরের থেকে আগত 'ব্রাহ্মণ' দ্বারা এই বেদপাঠ নিষ্পন্ন হওয়ায়, স্থানীয় 'পদণ্ড'রা কেউ-কেউ ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখেনি। এদের একজন আমায় জিজ্ঞাসা করে ব'সল, কি কি 'মুদ্রা' বা কর-মুদ্রা আমি জানি। এখানকার ব্রাহ্মণেরা দেবার্চনায় হাতের আঙুল দিয়ে নানা প্রকার 'মুদ্রা' ক'রে থাকেন। এই ব'লে সে পদণ্ডটি সাধা হাতে নানা-রকম মুদ্রা দেখাতে লাগ্‌ল। আমি এই বিষয়ে আমার অজ্ঞতা স্বীকার ক'রলুম। ব'ললুম যে আমি ব্রাহ্মণ মাত্র—পূজা-আচারে দক্ষ পুরোহিত বা 'পদণ্ড' শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নই। ভদ্রলোক মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রে ব'ললেন, আমাদের 'মহাগুরু' নিশ্চয়ই পূজা-অনুষ্ঠানের সব কয়টি মুদ্রাই ক'রতে পারেন—এমন কি বলিদ্বীপে জানা নেই এমন মুদ্রা নিশ্চয়ই শিক্ষাও দিতে পারেন। আমাদের এক বিপদে ফেললেন। পরে কবিকে এই পদণ্ডের কথা বলি। ইনি যে কবির কাছে নূতন মুদ্রা শিখতে আসবেন এবং মুদ্রার ব্যাপারে কবির দক্ষতাও যে যাচাই না ক'রে ছাড়বেন না, কবিকে সে কথাও বলি। কবি হাসতে হাসতে ব'ললেন, 'এই দেখ, তুমি কোথায় কার সঙ্গে আলাপ ক'রে যত বিভ্রাট্ ঘটিয়ে' আসবে—এখন জগতে আমার যেটুকু পসার হ'য়েছে এই বলিদ্বীপে এসে পদণ্ডদের দণ্ডাঘাতে সেটুকু বুঝি মাটি হ'য়ে যায়। কোনও রকমে তাকে ঠেকাও। সে যদি আমার মুদ্রার পরীক্ষা ক'রতে আসে, তা'হ'লে বিশ্বভারতীর জন্যে খালি ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে কিছু মুদ্রার জন্যেই দ্বারে-দ্বারে ঘুরছি, আমার আবার মুদ্রা কোথায়—আমি গরীব বেচারা দাঁড়িয়ে 'ফেল' হ'য়ে মারা যাবো।'

এখানকার ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরে আমার দেখা হয়। অজ্ঞাত-কুলশীল বিদেশী, রাজার কাছে দেশমান্য ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের সম্মান আমি পাই, এতে তাঁদের স্বাভাবিক উষ্মা ছিল। আমি বিনীতভাবে জানালুম, আমরা একই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অধিকারী, ভাইয়ের কাছে ভাইয়ের মতন তাঁদের দেশে এসেছি তাঁদের দেখতে, জানতে, শিখতে—তাতে আমরা উভয়ই লাভবান্ হবো—গর্ব বা মান্যতার বোধ নিয়ে আসিনি। এতে তাঁরা আশ্বস্ত হলেন, মেঘ কেটে গেল। উবুদ থেকে আমরা মুণ্ডুকে এলুম। এখানেও পাসাংগ্রাহানে উঠ্‌লুম। এখানে এসে আমরা খবর পেলুম যে মিস্ মেয়ো-র 'মাদার ইণ্ডিয়া' বেরিয়েছে। এবং বিলেতে এই নিয়ে খুব হৈ-চৈ শুরু হয়েছে। 'নিউ স্টেট্‌স্‌ম্যান' কাগজে মিস মেয়োকে সমর্থন করে সমালোচনা বেরিয়েছে। আর তাতে বলা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ নাকি শিশু-বিবাহের পক্ষপাতী। তাঁর সম্বন্ধে আরও যা সব বলা হয়েছে যেগুলি কোন সাধারণ উচ্চ শিক্ষিত লোকের পক্ষে বলাও লজ্জাকর। কবি অনিচ্ছুক হ'লেও বলিদ্বীপের মুণ্ডুকে ব'সে এই সমালোচনার উত্তর লিখলেন, ইংলাণ্ডের 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্জেন' পত্রে প্রকাশের জন্যে তা পাঠানো হ'ল। সেই সমালোচনার উত্তর যথা সময়ে ঐ কাগজে ও আর দেশে নানা পত্রে বা'র হয়েছিল।

৮ই সেপ্টেম্বর আমরা মুণ্ডুক থেকে বুলেলঙ-এ ফিরে আসি। বলি-লম্বকের রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত কারোন সাহেব এসে কবিকে জাহাজে তুলে দিয়ে গেলেন। আমরা নৌকায় ক'রে ডাঙ্গা থেকে জাহাজে উঠ্‌লুম। ছোট্ট জাহাজ, নাম 'ফান নেক' (Van Neck)। জাহাজটি আমাদের বলিদ্বীপ থেকে আবার যবদ্বীপ-সুরাবায়ায় ফেরৎ নিয়ে চ'ল্‌ল।

৯ই সেপ্টেম্বর সুরাবায়া বন্দরে আমাদের জাহাজ লাগ্‌ল। জেটীতে কবিকে স্বাগত করবার জন্যে অনেক ভীড় হয়েছিল। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আগত চিনির ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মদনলাল

ঝাম্ব, শ্রীযুক্ত লোকুমল ও অন্যান্য ভারতীয়েরাও এসেছিলেন। আর এসেছিলেন ষষ্ঠ মঙ্কুনগরোর পুত্র শ্রীযুক্ত আর্য-সুযান (Mr. Raden M. Harjo Soejono)—এঁদের বাড়ীতেই কবির থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই মঙ্কুনগরোরা (Mangkoe-nogoro) হচ্ছেন পূর্ব-যবদ্বীপের শুরকর্ত (Soerokarta) নগরের রাজা। এখন রাজা হচ্ছেন সপ্তম মঙ্কুনগরো। ষষ্ঠ মঙ্কুনগরোর সঙ্গে ডচ্ সরকারের বনিবনা না হওয়ায়, ইনি রাজপদ ত্যাগ করে সুরাবায়াতেই বাস ক'রছিলেন।

ভারতীয়েদের তরফ থেকে এক সভায় কবিকে সংবর্ধনা করা হ'ল। সুরাবায়ার রেসিডেণ্ট, স্থানীয় ব্রিটিশ ভাইস-কন্‌সাল, চীনের কন্‌সাল সকলেই উপস্থিত ছিলেন। কবিকে অভিনন্দন জানানো হ'ল, শ্রীঝাম্ব অভিনন্দন-প্রশস্তি প'ড়লেন। বিশ্ব-ভারতীর জন্যে হাজার টাকার তোড়া কবিকে দেওয়া হ'ল। লোকুমল কবির পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁর দোকানে পায়ের ধুলো দেবার জন্যে কবিকে নিমন্ত্রণ ক'রলেন। এখানে শোনা গেল যে মিস্ মেয়োর বই আর নিউ-স্টেটসম্যানের সমালোচনা হলাণ্ড মারফৎ যবদ্বীপেও প্রচারের চেষ্টা হ'চ্ছে। দু'চার জন ডচ্ বন্ধু ব'ললেন, ম্যাঞ্চেস্টার গার্জেনের জন্যে লেখা চিঠিখানা ইংরিজী আর ডচ্ অনুবাদে যবদ্বীপেও সর্বত্র প্রকাশিত হওয়া উচিত। কতক-গুলি পত্রিকার সম্পাদক এই চিঠি প্রকাশ ক'রবেন স্থির হ'ল।

শ্রীযুক্ত লোকুমলের দোকানে একদিন যাওয়া হ'ল। কবির আগমনে লোকুমল শেঠ একেবারে কৃতার্থ। তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে তিনি সওয়া শ' গিলডারের একটি থলে' আর খানকতক অতি সুন্দর যবদ্বীপের 'বাতিক' কাপড় কবির সামনে ধরে দিলেন। আর একজন সিন্ধী ব্যবসায়ী বিশ্বভারতীর জন্যে একান্ন গিলডার, একটি হাতির দাঁতের বাক্স ও কিছু 'বাতিক' কাপড় ভেট দিলেন।

শ্রীযুক্ত সুযানের বৈঠকখানায় যবদ্বীপের যুবকদের সমাগমে

কবি কিছু বলেন। শ্রীযুক্ত বাকে দোভাষীর কাজ ক'রলেন। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে মিলন সম্ভব কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে কবি ব'ললেন যে মানুষের মানসিক আর আধ্যাত্মিক জীবনই যাঁদের কাছে সত্যকার জীবন ব'লে মনে হয়, তাঁরা যদি এই **intellectual** আর **spiritual** দিক্ নিয়ে মিল করবার চেষ্টা করেন, তবেই এই মিল সম্ভব হবে, সার্থক হবে; আর এই মিলের আধারের উপরেই পরে আর সব বিষয়ের সমাধান হ'তে পারবে।

ডচ্ ডাক্তার ক্লাফর্ভাইডন (**Dr. Klaverweiden**)-এর সঙ্গে কবির একদিন সাক্ষাৎ হয়েছিল। ইনি বিশ্বভারতী কলাভবনের জন্যে একটি মূল্যবান উপহার দিলেন—সেকেলে কাঠের সিন্দুকে ক'রে অনেকগুলি 'ওয়াইয়াঙ' (**wajang**) বা ছায়া-নাট্যে ব্যবহৃত চামড়ায় কাটা আর খুব রঙচঙে' আর সোনালী কাজ-করা বা পট ছবি। সুরাবায়া ত্যাগের আগের দিন রাত্রে স্থানীয় **Kunstkring** বা ডচ্দের সাহিত্য-সঙ্গীত-কলা সভায় কবির বক্তৃতা ছিল। ডচ্ সমাজের প্রায় সব বড়-বড় লোকই এসেছিলেন। '**What is Art**' সম্বন্ধে কবি এই উপলক্ষ্যে বক্তৃতা দেন।

গুবেঙ স্টেশনে আমরা শূরকর্তের ট্রেনে চ'ড়লাম। শ্রীযুক্ত সুরযানও আমাদের সঙ্গে চ'ললেন। বিকেলের দিকে আমরা শূরকর্তে পৌঁছলুম। শহরটির নাম সংস্কৃতে হ'চ্ছে 'শূরকৃত' অর্থাৎ শূরের বা বীরের কৃত নগরী। এই পোষাকী নামটির একটি ছোট্ট সংক্ষিপ্ত রূপ আছে—সেটি হচ্ছে **Solo** সোলো। স্টেশনে আমাদের নিতে এসেছিলেন ডাক্তার রাজিমান (**Radjiman**) ব'লে এক যবদ্বীপীয় ভদ্রলোক, আর সোলোতে যাঁর বাড়ীতে আমরা থাকবো সেই সপ্তম মঙ্কুনগরোর দু'জন প্রতিনিধি। মঙ্কুনগরোর প্রাসাদে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পরেই, স্বয়ং মঙ্কুনগরো কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে এলেন। কবিকে সঙ্গে নিয়ে আমরাও স্থানীয় ডচ্ সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা ক'রে এলুম। রাত্রে যবদ্বীপীয় গামেলান বাজনার সঙ্গে 'গোলক্' (**Golak**) নাচ দেখলুম। যব-

দ্বীপের সঙ্গীত আর বাদ্য নিয়ে কবি, মঙ্কুনগরো, ডাক্তার রাজিমান, কোপ্যারব্যার্গ আর বাকে আলোচনা ক'রতে লাগলেন। মাঝে আহারের জন্যে কিছুক্ষণ নাচ বন্ধ রইল। আহারাদির পরে আবার নাচ শুরু হ'ল। এই দ্বিতীয় পর্বের নাচের নাম 'কাম্বিওঙ্' (Kambiong)—এই নাচ খুব ভালো হয়েছিল। কবি খুব মোহিত হয়েছিলেন। যতদূর স্মরণ হচ্ছে, কবি যেন বলেছিলেন—যব-দ্বীপের মেয়েরা যেভাবে নাচলে, স্বর্গের অপ্সরাদের নাচ তার চেয়ে কত ভালো হ'ত, তা' তাঁর কল্পনার অতীত। যবদ্বীপকে উদ্দেশ্য ক'রে কবি যে বাঙলা কবিতাটি লিখেছিলেন, তার ইংরিজী অনুবাদ কবি নিজেই করেছিলেন। ইংরিজী থেকে ডচ্ অনুবাদ করেন শ্রীযুক্ত বাকে। ডচ্ থেকে যবদ্বীপীয় ভাষায় অনুবাদ করান মঙ্কুনগরো। এই অনুবাদটি মঙ্কুনগরোর মেয়েরা গান গেয়ে কবিকে শোনালে।

এখানে আসার একদিন পরেই মঙ্কুনগরো কবির সম্মাননার জন্যে একটি বড়ো ভোজ দিলেন। এই উপলক্ষে যবদ্বীপীয় নৃত্যের বিশেষ-রূপে আয়োজন করা হ'য়েছিল। তাঁর প্রাসাদের বিরাট বড়ো মণ্ডপটিতে এই নাচের আর ভোজনের অনুষ্ঠানটি হ'য়েছিল। খাওয়ার ভোজ্য-তালিকা ইংরিজীতে ছাপান হায়ছিল—তার উপরে লেখা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংবর্ধনার জন্যে মঙ্কুনগরোর গৃহে নৈশ-আহারের পদ-তালিকা। কবির যবদ্বীপের প্রতি কবিতাটির ইংরিজী আর ডচ্ অনুবাদ বেশ চমৎকারভাবে পুস্তকাকারে ছাপানো হ'য়েছিল, সেই বই সমাগত অতিথিদের মধ্যে বিতরিত হ'ল—কবির আর মঙ্কুনগরোর হস্তাক্ষর সমেত।

শুরকর্ত-তে দু'জন রাজা আছেন। একজন মঙ্কুনগরো—এঁর কথা এতক্ষণ ব'ললুম। অন্য জনের উপাধি হচ্ছে সুসুহুনান্ (Soesoehoenan)। পদমর্যাদায় সুসুহুনান্ যবদ্বীপের তাবৎ দেশীয় রাজাদের মধ্যে প্রধান। সেই রাজা, দশম পাকু-ভুবন (Pakoeboewono X) রবীন্দ্রনাথকে একদিন তাঁর Kraton

অর্থাৎ রাজপ্রাসাদ-এ নাচ দেখবার জন্যে আমন্ত্রণ জানান। রাজা-বরোধের নয়জন কন্যার এই নাচ খুবই চিত্তাকর্ষক হ'য়েছিল। এই নাচের নাম 'বেডোয়া (Bedojo)।

মাঝে একদিন স্থানীয় Kunstkring-এ এক সভায় কবি বক্তৃতা দিলেন। বাকে ডচ্ ভাষায় তর্জমা ক'রলেন।

কয়েকদিন পরে স্থানীয় Contact Club-এর হলে যবদ্বীপীয়রা একটি কবি-সংবর্ধনার ব্যবস্থা করলেন। এখানকার যবদ্বীপীয় সমাজের তাবৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, ডচ্ ভদ্রলোকও ছিলেন অনেকগুলি। রাজকুমার কুসুমায়ুধ (Koesoemjoedo) (সুসুহুনানের দুই ছেলের একজন) ইংরিজীতে কবিকে স্বাগত ক'রে ছোট একটি বক্তৃতা দিলেন। ডাক্তার রাজিমানও বক্তৃতা দিলেন। 'কথা ও কাহিনী'র চারটি কবিতা—'অভিসার, মূল্যপ্রাপ্তি, স্পর্শমণি, বিচার'—যার বাঙলা থেকে আমি ইংরিজী ক'রে দিই, আর বাকে করেন ডচ্ ভাষায় তার যবদ্বীপীয় অনুবাদ ডাক্তার রাজিমান পাঠ ক'রে শোনালেন। অনেকেই বক্তৃতা দিলেন। কবিকেও কিছু ব'লতে হ'ল।

শুরকর্তায় একটি নোতুন রাস্তা কবি সাধারণের জন্যে উন্মুক্ত করলেন। রাস্তার নামকরণ হ'ল কবির নামে—Tagorestraat। এই উদ্বোধন-কার্য শেষ করে কবি এলেন প্রাম্বানানে। এখানে বিরাট্ প্রাচীন খণ্ডগৃহ—'খঁড়হর' অর্থাৎ বিধ্বস্ত প্রাচীন মন্দিরাদির সমাবেশ কবি দেখলেন। রবীন্দ্রনাথকে প্রাম্বানান ভালো করে দেখাবার জন্যে ডচ্ সরকার সেরা বন্দোবস্ত করেছিলেন। দ্বীপময়-ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্তা Dr. F. D. K. Bosch বস্ স্বয়ং সেখানে হাজির ছিলেন। এখানে শিব, বিষ্ণু আর ব্রহ্মার তিনটি বড় বড় মন্দির আছে। ছোট শিবমন্দিরও অনেকগুলি।

প্রাম্বানান থেকে আমরা যোগ্যকর্তায় (Jogiakarta) পেঁছুলুম। এই শহরটির প্রাচীন শুদ্ধ সংস্কৃত নাম হচ্ছে 'অযোধ্যাকৃত'। এখানকার এক রাজা, 'পাকু-আলম' (Pokoe Alam) যাঁর উপাধি,

তাঁর বাড়ী অতিথি হওয়া গেল। যোগ্যকর্তায় অন্যতম রাজা (মান্যে ইনি পাকু-আলমের চেয়ে উঁচু) সুলতানের সেদিন ছিল জন্মদিন। তাঁর রাজবাড়ী 'ক্রাতন'-এ, ডচ্ রেসিডেণ্ট ও পাকু-আলম সমভিব্যবহারে 'সেরিম্পি' (Serimpi) নাচ দেখতে গেলুম। কবির সঙ্গে সুলতানের পরিচয় হ'ল। 'সেরিম্পি নাচ', 'বেডোয়ো' নাচের চেয়ে অনেক আভিজাত্যপূর্ণ ব'লে মনে হ'ল। পাকু-আলমের মন্ত্রী বা 'পতি'র বাড়ী একদিন রাত্রে রামায়ণ অভিনয় দেখে আসা গেল। রাজবাড়ীর ছেলেরা মিলে এই অভিনয় করেছিল। স্থানীয় **Kunstkring** বা ডচ্‌দের বিদগ্ধ সভায় কবি তাঁর ইংরিজী আর বাঙলা কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনালেন। কবির সঙ্গে একদিন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অনুপ্রাণনায় প্রতিষ্ঠিত 'তামান শিশ্ব' (Taman Siswo) বিদ্যালয় দেখতে যাওয়া গেল। এখান থেকেই আমরা বরবুদুর (Boroboedoer) স্তূপ দেখতে গেলাম। বরবুদুর আর তার কাছাকাছি আর দুটি ছোট মন্দির—'চন্দী সেন্দুৎ' আর 'চন্দী পাওন'—এই তিনটি নিয়ে একটি মন্দিরচক্র। সেখানে ডাক্তার বস্ আর ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্ (Callenfels) কবির জন্যে অপেক্ষা ক'রছিলেন।

বরবুদুরের পাশেই ডচ্ সরকার একটি 'পাসাঙগ্রাহান' বা ডাকবাঙলা ক'রে দিয়েছেন। আমরা এখানে উঠ্‌লুম। কবিকে নিয়ে আমরা দলবদ্ধ হ'য়ে চৈত্যের উপরে উঠ্‌লুম। কবি তিনটি ভূমির উপরে উঠ্‌তে উঠ্‌তে শ্রান্তি অনুভব করলেন, আমরা তাঁকে আর না উঠ্‌তে অনুরোধ করলুম। দ্বিতীয় ভূমির কতকগুলি চিত্র তিনি দেখলেন। পরদিন 'পাসাঙগ্রাহানে' ব'সে ব'সে কবি দূর থেকে বরবুদুরের শোভা দেখতে লাগলেন, আর এই সময়েই তাঁর বিখ্যাত 'বর-বুদুর' কবিতাটি লিখে ফেললেন।

পরদিন দুপুরে আমরা যোগ্যকর্তায় ফিরলুম। রাত্রে পাকু-আলম কবির সম্মাননার জন্যে একটি বড় ডিনার পার্টি দিলেন। যোগ্যকর্ত-র ডচ্ আর যবদ্বীপীয় সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিই আমন্ত্রিত

হয়েছিলেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর আমরা ট্রেনে বাতাবিয়ার পথে যাত্রা করলুম। পথে বান্দুঙ শহরে নামলুম। বান্দুঙে আমরা দু'দিন ছিলুম। উঠ্‌লুম শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী দেমণ্ট (Demont) নামে এক ডচ্‌ দম্পতির অতিথি রূপে তাঁদের বাড়ীতে। সেখানে কবি স্থানীয় কনকর্ডিয়া (Concordia) সভার সুন্দর হল-ঘরে Kunstkring-এর আমন্ত্রণে একটি বক্তৃতা দেন। বিষয় ছিল—What is Art. এখানে সকালে ও দুপুরে প্রচুর সিন্ধীদের আগমন ঘ'টতে লাগল। একদিন ভারতীয়দের এক সভায় কবিকে মানপত্র দেওয়া হ'ল।

একদিন তিনজন যবদ্বীপীয় যুবক কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। এরা যবদ্বীপের স্বরাজ-কামী দলের নেতা। একজনের নাম সুকর্ণ (Soekarno), ইনি হলাণ্ড-ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার। বেশ ইংরিজী জানেন। বুদ্ধিমান, প্রিয়দর্শন। কবির আর আমাদের এঁদের বেশ ভালো লাগ্‌ল।

ইনিই পরে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-যুদ্ধের অন্যতম নেতা হন, আর ১৯৪৫ সালে এঁর সহকর্মীদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এখন ইনিই হ'চ্ছেন স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি ডাক্তার আহমদ সুকর্ণ (Dr. Ahmad Sukarno)।

২৭শে সেপ্টেম্বর আমরা বান্দুঙ ছাড়লুম। সেদিনই পেঁছিলুম বাতাবিয়ায়।

বাতাবিয়ায় আমরা প্রথমবারে যেখানে উঠেছিলুম, কবি, সুরেনবাবু আর বাকে সেই Hotel des Indes-এ উঠ্‌লেন। আমরা উঠ্‌লুম সিন্ধী বণিক্‌ বাসিয়ামল্ল আসোমল্ল-এর (Wassiamall Assomall) ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ নবলবায়ের বাড়ীতে, তাঁর অতিথি হয়ে। এখানে আমরা প্রায় তিনদিন ছিলুম। কবি একদিন স্থানীয় মিউজিয়ম দেখে এলেন। একদিন কবিকে ও আমাদের স্থানীয় এক সিন্ধী বণিক্‌ শ্রীযুক্ত মেথারাম নিমন্ত্রণ

ক'রে খাওয়ালেন। একদিন বাতাবিয়ায় **Kunstkring**-এ কবি তাঁর ইংরিজী ও বাঙলা কবিতা পাঠ ক'রে শোনালেন। বাঙলা ভাষার ঝঙ্কার কবির মুখে শুনে এরা সবাই খুশী হয়েছিল।

এখানকার ডচ্‌দের স্থাপিত শিল্প ও বিজ্ঞানসভায় (আমাদের 'এশিয়াটিক্ সোসাইটি'-র মতন) আমি একটি বড় বক্তৃতা পাঠ করলুম—বিষয় ছিল, ভারতের সভ্যতার পত্তন ও তাহাতে অনার্য উপাদান। এটি পরে এই সভার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৩০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার কবি বিপুল জনসমাগমের মধ্যে যবদ্বীপ থেকে বিদায় নিলেন। আমাদের ফিরতি জাহাজের নাম 'মাইয়ার' (**Mijer**)। আমি একদিনের জন্যে রয়ে গেলুম। কবির সঙ্গে সিঙ্গাপুরে গিয়ে মিলিত হ'বো। সেখান থেকে আবার নতুন ক'রে ভ্রমণ শুরু হবে। আপাততঃ দ্বীপময়-ভারত ভ্রমণ শেষ হ'ল। এবারের ভ্রমণপর্ব শ্যামে। সেখান থেকেও কবির নিমন্ত্রণ এসেছে ॥

Life Time, Rabindra Centenary Issue, 1961.

রবীন্দ্রনাথের ‘জীবন-দেবতা’

[বৈদিক উর্বশী, গ্রীক আফ্রোদীতে, সুফী বিশ্বপ্রিয়া]

রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতাটি বাঙ্গালা ভাষায় উপলব্ধি ও কল্পনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ রূপে বিদ্যমান, এবং বিশ্ব-সাহিত্যেও এইরূপ কবিতা সুদুর্লভ। বিশ্ব-প্রপঞ্চ ও মানব-জীবন উভয়েরই মাধ্যমে কার্য্যকর জীবনের আধার এবং পটভূমিকা রূপে শাশ্বত সত্তা ও সত্য নানা ভাবে আপনি মানুষের কাছে দেখা দেয় ও ধরা দেয়—মানুষও নানা ভাবে তাহাকে দেখিতে চায় ও ধরিতে চায়। মানুষের ব্যক্তিগত প্রকৃতি, রুচি ও আকাঙ্ক্ষা সংখ্যাতীত; শাশ্বত সত্যও বিশ্বের বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে সংখ্যাতীত পৃথক্ পৃথক্ রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। সূফী দার্শনিক এই ভাবের কথা-ই বলিয়াছেন—'ত্বুরুক-ল্লাহি ক-্াঅদাদ অন্‌ফাসি-ল্-মখ্‌লুক্বাতি—অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তুসমূহের নিঃশ্বাসের সংখ্যার মত-ই ঈশ্বরের প্রকাশলীলা অনন্ত। রবীন্দ্রনাথের মনে এই শাশ্বত সত্তা যে ভাবে নিজেকে ধরা দিয়াছিল, তাঁহার যৌবনকালের 'জীবন-দেবতা' পর্য্যায়ের কবিতাগুলিতে (মুখ্যতঃ 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'-র এবং 'উৎসর্গ'-র কতকগুলি কবিতায়, এবং প্রকীর্ণ অন্য কতকগুলি কবিতায়) তাহা অদ্ভুত মনোহর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ভাব ও তাহার প্রকাশ উভয়-ই চিরন্তন, এবং একাধারে নবীন ও প্রাচীন। নানা দেশে নানা যুগে নানা শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শাশ্বত বস্তুর প্রকাশ বহুধা অর্থাৎ বহু বিভিন্ন রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহার মধ্যে একটি নূতন ভঙ্গী আনিয়া দিয়াছেন; তাহাতে এই চিরন্তন সত্তা আবার নূতন রূপে আমাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং আমাদের আকুল করিতেছে। এই বিশ্বজনীন আবার রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের বা ব্যক্তিগত উপলব্ধির রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া, যেন বিশেষ ভাবে রবীন্দ্রনাথের-ই সত্যদর্শন ও অনুভূতির বাণী বহন করিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করিয়া বিষয়টির আলোচনা আরম্ভ করা যাউক। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন ডচ্-ইন্ডিয়া বা

ইন্দোনেসিয়া অর্থাৎ দ্বীপময় ভারতে (যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপে) ভ্রমণ করিতে যান, তখন আমাকেও তিনি সঙ্গে লইয়া যান। যবদ্বীপের বাতাবিয়া নগরে দুই তিনদিন থাকিবার পরে আমরা সুরাবায়াতে যাই, এবং সেখান হইতে আমাদের বলিদ্বীপ যাত্রা হয়। বিকেল বেলায় আমরা সুরাবায়াতে জাহাজে চড়ি, তাহার পরের দিন ভোরে উত্তর-বলিদ্বীপের বন্দর বুলেলেঙ্-এ পৌঁছিবার কথা। সন্ধ্যার প্রথমেই জাহাজের যাত্রীদের সায়মাশ সম্পন্ন হইল। রবীন্দ্রনাথ উপরের খোলা ডেকে আসিয়া বসিলেন, ওলন্দাজ ও ইন্দোনেসীয় অনুরাগী সহযাত্রিগণ চারিদিকে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সদালাপ চলিতে লাগিল। আমি একটি ইন্দোনেসীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে ডেকের উপরে পায়চারি করিতেছি। একটু দূরে খোলা ডেকের উপরেই একটি ছোটো টেবিলের সামনে দুইখানি চেয়ারে একটি দম্পতি উপবিষ্ট—পোষাকে পুরুষটিকে আমেরিকান পাদ্রি বলিয়া মনে হইল। আড় চোখে চাহিয়া দেখিলাম, স্বামীটি একটু ভালোমানুষ গোছের সরলপ্রাণ ব্যক্তি; স্ত্রীটির ইচ্ছা, স্বামী গিয়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একটু আলাপ জমান, কিন্তু স্বামীটি মিশুক নহেন, ইতস্ততঃ করিতেছেন। শেষটায় দেখিলাম, বেচারা পাদ্রি স্ত্রীর তাড়নায় উঠিয়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হইবার উদ্দেশ্যে আমার কাছেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন—পরিষ্কার আমেরিকান নাকী টানের ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, **Sir, you are travelling with Tagore, the poet**? আপনি কি ঠাকুর-কবির সঙ্গে যাইতেছেন? আমি বলিলাম, **Yes, what can I do for you**? হাঁ, আপনার জন্য কী করিতে পারি? পাদ্রি তখন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—**Can I have a talk with him for two minutes by the clock**—ঘড়ি ধরিয়া মাত্র দুই মিনিটের মতন তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে পারি কি? আমি বলিলাম, একটু অপেক্ষা করুন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।

পাদ্রির সঙ্গে আমি যে কথা কহিতেছি, কবি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে গিয়া বলিলাম, ভদ্রলোকটি 'ঘড়ি ধরিয়া দুই মিনিট মাত্র' আপনার সঙ্গে কথা কহিতে চান। কবি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে ওটি? পাদ্রি মনে হইতেছে। আমি উত্তর দিলাম, হাঁ, পাদ্রি, আমেরিকান পাদ্রি। বিশেষ করিয়া আমেরিকান পাদ্রি শুনিয়া, রবীন্দ্রনাথ একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। নোবেল পারিতোষিক পাইবার পরে যখন আন্তজাতিক নামযশ তাঁহার হইল, তাহার পরে জাহাজে ভ্রমণ-কালে দুই-দুইবার আমেরিকান পাদ্রি তাঁহার উপরে চড়াও হয়—তাঁহাকে যদি খ্রীষ্টান করিতে পারা যায় এই চেষ্টায়। ঘর-পোড়া গোরু সিন্দুরে' মেঘ দেখিয়া ডরায়—রবীন্দ্রনাথের সেই অবস্থা। আমি বলিলাম, যদি বেয়াদবি করে তাহা হইলে সরাইয়া লইয়া যাইব। তখন কবি নিরুপায় ভাবে বলিলেন, আচ্ছা, ডেকে নিয়ে এসো। রবীন্দ্রনাথের সামনে আসিয়াই আমেরিকান কায়দায় হৃদ্যতা দেখাইয়া খুব জোরে তাঁহার হাত ধরিয়া ঝাঁকিয়া পাদ্রিটি বলিলেন, Glad to make your acquaintance, Sir. After all, we follow the same religion—মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া সুখী হইলাম—আমরা তো মোটামুটি ভাবে এক-ই ধর্ম পালন করি। ধর্ম-বিষয়ে বিচারের উদ্দেশ্যে একেবারে সোজা মুখপাত। কবি শুধাইলেন—Hows that? সেটা কী রকম? পাদ্রি ব্যাখ্যা করিলেন—Aren't our idea about God the same? ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কি এক ধরনের নয়? কবি উত্তর দিলেন, I doubt it very much—সে বিষয়ে আমার খুব-ই সন্দেহ আছে। তখন পাদ্রি বলিলেন, Why, don't we both worship God as Father? কেন, আমরা দু'জনেই ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া পূজা করি না? আমি দেখিলাম—এই বার God as Father বা 'পিতা ঈশ্বর', ইহার পরে God the Son বা 'পুত্র ঈশ্বর' এবং God the Holy Ghost বা 'পবিত্র আত্মা ঈশ্বর' আসিবেন—সেইজন্য তাড়া-

তাড়ি কবি কিছু বলিবার আগেই বলিলাম—Yes, we worship God as Father ; we also worship as mother, as Son, as Friend ; we also worship him as a Lover ; and we dare worship him even as Sweetheart—আমরা পিতা রূপে ঈশ্বরের আরাধনা করি ; তা ছাড়া মাতা রূপেও করি, পুত্র আর মিত্র রূপেও করি ; আমরা ঈশ্বরকে প্রণয়াস্পদ রূপেও আরাধনা করি ; এমন কি তাঁহাকে প্রণয়িণী রূপেও আরাধনা করিবার সাহস রাখি। 'সদা-প্রভু পরম পিতা' পরমেশ্বরের সঙ্গে এ কী সৃষ্টি-ছাড়া সম্বন্ধের কল্পনা ! পাদ্রিটি আমার কথা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকাইয়া রহিলেন—কিন্তু কবি নির্বাক্, নিশ্চল, স্থির গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলেন, আমার কথার প্রতিবাদ করিলেন না। তখন পাদ্রিটি কিছু না বলিয়া হঠাৎ স্থান ত্যাগ করিয়া একেবারে গট্‌গট্ করিয়া গিয়া অপেক্ষমানা স্ত্রীর পাশে চেয়ারে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন—বোধ হয় স্ত্রীকে যাহা বলিলেন তাহা এই ধরনের কথা-ই হইবে—গিন্নী। এরা বলে কী ! লোকগুলো উন্মাদ !

এই যে God the Sweetheart-এর কল্পনা, এটি একটি নূতন বস্তু নয়। মানব যখন হইতেই ঈশ্বর বা শাশ্বত সত্তার সহিত নিজের ব্যক্তিগত যোগের বা আকর্ষণের কথা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন হইতেই তাহার সামাজিক পরিবেশের প্রসার বা উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে ঐ সত্তার সহিত সে নানাবিধ সম্পর্কের কল্পনা করিতে লাগিয়া গিয়াছে। পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক পতি-পত্নী রূপে বা প্রেমিক-প্রেমিকা রূপে যখন romantic অর্থাৎ রমন্যাস বা অনুরাগ-রঞ্জিত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল, দেহাশ্রয়ী সম্পর্ক যখন অতিদৈহিক পর্য্যায়ে sublimated বা উন্নীত হইল, বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বনিয়ন্তা এবং বিশ্বাতিগ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরাৎপরের সহিত এই প্রকারের অনুরাগ-রঞ্জিত নিবিড়তম

সংযোগকে তখন মানুষ অন্যতম চরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বা পরমার্থ বলিয়া চিন্তা করিতে শিখিল। মানব-সমাজে এক দিকে যেমন শাশ্বত সত্যের সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা দিতেছিল, এবং সেই সচেতনতাকে অবলম্বন করিয়া সত্যের বা পরমার্থের উপলব্ধি বা অনুভূতির আকাঙ্ক্ষা ধর্মসাধনা রূপে প্রকট হইতেছিল, তেমনি অন্য দিকে নরনারীর মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক-ও জীবনের অন্যতম প্রেয়ঃ এবং শ্রেয়ঃ বলিয়া পরিগণিত হইয়া শ্রেয়ের প্রতীক বা সাধন-রূপে কবিদৃষ্টি-যুক্ত মানব-মনের নিকট প্রতিভাত হইল। জ্ঞানের পথে ও কর্মের পথে যেমন শাশ্বত সত্তার উপলব্ধির চেষ্টা আরম্ভ হইল, তেমনি পরে এই অনুরাগের পথও আবিষ্কৃত হইল। সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের সৌন্দর্য্য-বোধও জাগ্রত হইল। সমাজে সব বিষয়ে নেতা বা পরিচালক ছিল পুরুষ, এবং পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী-ই সব বিষয়ে ছিল প্রবল—এমন কি মেয়েরাও অবস্থাগতিকে পড়িয়া পুরুষের চোখেই সমস্ত বিষয় দেখিতে অভ্যস্ত হয়। নারী-সম্বন্ধে পুরুষের ধারণা যেমন-যেমন **romantic** বা অনুরাগের পর্য্যায়ে উঠিতে লাগিল, পুরুষও তেমনি-তেমনি কবিতায়, গানে, কাব্যে ও শিল্পে তাহার উচ্ছ্বসিত ও পরিপূর্ণ পরিচয় দিতে লাগিল। নারী তো নরসমাজে পরিবার ও গৃহের পত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে, গৃহধর্মের সহধর্মিণী-রূপে প্রথম হইতেই ছিল। তাহার উপরে, নারী-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও মাঙ্গল্য, শ্রী ও কল্যাণ আসিয়া ভাবুক পুরুষের কাছে নারীর মর্য্যাদা আরও উঁচুতে তুলিয়া ধরিল। বাস্তব ও কল্পনা, জৈব আকর্ষণ এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক জগতে তাহার উন্নয়ন—এই দুইয়ে মিলিয়া পুরুষের কল্পনার কেন্দ্র করিয়া তুলিল নারীকে। অপর, যে শাশ্বত বস্তুর সম্বন্ধে মানুষ এই ভাবে সচেতন হইল—

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি ;
বিশ্ব-বিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি ;
তুমি আছো মোর জীবন মরণ হরণ করি—

রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা'

মানবী আকৃতিতে তাহার যেন নানা রূপায়ণ মানব-চিত্তে ঘটিল, নারী-মূর্তিও তাহার মধ্যে পুরুষ-আকৃতির প্রতিস্পর্ধী হইয়া দেখা দিল। নারী একাধারে প্রণয়িনী ও জননী; নারী আবার একদিকে নর্মসখী ও অন্যদিকে কল্যাণময়ী গৃহলক্ষ্মী। পুরুষের **complementary** বা পরিপূরক আবার নারী। সুপ্রাচীন যুগ হইতেই সব দেশের পুরুষ, সে যাহা আন্তরিক ভাবে কামনা করে, তাহাকে নারী-প্রতীকেই পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে। **The World's Desire** অর্থাৎ 'বিশ্ববাসনা' নিজ বিকশিত রূপ লাভ করিয়াছে নারী-মূর্তিতে; কবির এই উক্তি মানবসাধারণ—'অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা'।

কিন্তু তাই বলিয়া সর্বত্রই যে নারী-প্রতীকে বিশ্বসত্তার বা শাশ্বত সত্যের আবাহন হইয়াছে, তাহা নহে। বিভিন্ন জন-সমাজের সামাজিক পারিপার্শ্বিকের আধারে এ বিষয়ে সেই সমাজের চেতনাও গড়িয়া উঠিয়াছে। **Patriarchal** অর্থাৎ পিতৃনিষ্ঠ সমাজে মাতার স্থান পিতার পরে; আবার তেমনি **Matriarchal** অর্থাৎ মাতৃনিষ্ঠ সমাজে পিতার স্থান নগণ্য, মাতা-ই সেখানে রানী, মাতা-ই পরমা দেবী। পৃথিবী বা ধরণী বা ধরিত্রী—সকলকে ধরিয়া আছেন, ক্রোড়ে করিয়া আছেন এই প্রশস্ত ভূমিময় জগৎ—প্রায় সর্বত্র মাতা রূপে কল্পিত—আমাদের 'পৃথিবী মাতা', 'ধরতী মা'। এই মনোভাবও আদিম মানবের মনোভাব। পিতৃনিষ্ঠ ও মাতৃনিষ্ঠ উভয় পারিপার্শ্বিকের মিলনের ফলে আর্য্যদের 'দ্যোষ্-পিতা' ও 'পৃথ্বী মাতা' উভয়ের মিলিত কল্পনা গড়িয়া উঠে। এবং প্রাগ্-আর্য্য যুগের পশ্চিম এশিয়া-খণ্ডের আর্য্যেতর জাতি-সমূহের মধ্যে শিব-উমা বা শিব-শক্তির দর্শন-মূলক প্রতিষ্ঠা ঘটে। অন্যান্য নানা জাতির মধ্যেও এইরূপ নর-নারী বা পিতা-মাতার অথবা পুরুষ-প্রকৃতির যুগ্ম কল্পনা দেখা যায়। ভারতের আদিবাসী কোল-জাতির মধ্যে 'সেমা' (Serma) বা আকাশ ও 'অতে' (Ote) বা পৃথিবী 'আপা-এঙা' (Apa Enga) বা পিতা-

মাতা রূপে কল্পিত। পোলিনেসীয় জাতির মধ্যে 'পাপা-রাঙি' বা পাপালাঙি অর্থাৎ পৃথিবী (Papa) ও স্বর্গ যা আকাশ (Langi, Rangi), চীনাদের মধ্যে Yang 'য়াঙ্' বা পুরুষ ও Yin 'য়িন্' বা প্রকৃতি, এইরূপে বিশ্ব-প্রপঞ্চের মূল কারণ বলিয়া বিবেচিত।

এইরূপে দেখা যায় যে, শাশ্বত সত্তার সহিত মানব অন্তরঙ্গ-ভাবে নানা সম্বন্ধের কথা স্থির করিয়াছে—প্রভু, পিতা, মাতা, পুত্র, সখা, পতি, প্রণয়িনী প্রভৃতি। এইরূপ নানা প্রকারের সম্বন্ধ মানুষ যে করিয়া থাকে, মানুষ করিতে বাধ্য, তাহা প্রাচীন ভারতে অতি সহজ-ভাবেই স্বীকার করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের 'একং সদ্, বিপ্রা বহুধা বদন্তি', উপনিষদের 'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব', এবং 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥' প্রভৃতি বচনে, এবং গীতার 'গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানম্ বীজম্ অব্যয়ম॥' প্রভৃতি শ্লোকে, এই বিশ্বতোমুখ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। পরে বৈষ্ণব চিন্তায় শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই কয় পর্য্যায়ে এই ব্যক্তিগত সংযোগ শ্রেণী-নিবদ্ধ হয়। সময় বা অবস্থা-অনুসারে এক-ই ব্যক্তি একাধিক সম্পর্কের ভাবনা করিতে পারে ও করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে, বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে, এই রসাত্মক বা অনুরাগময় মধুর সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ এবং সর্বোচ্চ কোটির বলিয়া স্বীকৃত। এই সম্পর্কে, মানব অথবা মানবাত্মা হইতেছে 'শাশ্বত নারী, এবং পরম সত্য বা চরম সত্তা হইতেছেন 'পুরুষ—পুরুষোত্তম'; গোপী ও শ্রীকৃষ্ণ, এই দুই প্রতীকে এই সম্পর্ক বৈষ্ণব দর্শনে ও অনুভূতিতে রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই মধুর রসের বা অনুরাগের সম্পর্কের সাধনায় চিরকাল ধরিয়া ভারতবর্ষে সর্বত্র সব শ্রেণীর সাধক, যাঁহারা শুষ্ক জ্ঞান ও বিচারের পথের বাহিরে প্রধানতঃ রসানুভূতির পথ গ্রহণ

করিয়াছেন, 'মানবাত্মা নারী-প্রকৃতিক ও পরমাত্মা পুরুষোত্তম', এই ভাবেরই ভাবুক হইয়াছেন। অবশ্য, একাত্মবোধের অবস্থায় নারী বা পুরুষ কাহারও এই বিভেদ-বুদ্ধি থাকে না—বৈষ্ণব সাধক পদকার যেমন বলিয়াছেন, 'না সো রমণ, না হম রমণী'—কিন্তু সাধারণ ধারণায় এই ভাবের সিদ্ধান্ত বা আরোপ প্রচলিত। অবশ্য এই সাধারণ ধারণা বা বোধের ব্যত্যয়ও ভারতের আধ্যাত্মিক অনুভূতির ইতিহাসে আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন বা সংযোগকে, অথবা জীবাত্মা কর্তৃক নিজের মধ্যে পরমাত্মার উপলব্ধি বা অনুভূতিকে, 'প্রিয়া স্ত্রী'র সঙ্গে পুরুষের মিলনের সহিত উপমিত করা হইয়াছে (বৃহদারণ্যক —৪।৩।২১)—'তদ্বাস্যৈতদতিচ্ছন্দা অপহত-পাপ্মাভয়ং রূপং—তদ্যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, নান্তরম্, এবায়ম্ পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, নান্তরং—তদ্বাস্যৈ-তদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্।' ঋগ্বেদেও (১০।৭১।৪), কবি বা ঋষির কাছে বাগ্‌দেবীর আত্মপ্রকাশকেও অনুরূপ প্রতীকে দেখানো হইয়াছে—

'উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্
উত ত্বঃ শৃণ্বন্ শৃণোতি এনাম্
উতো তুঅস্মৈ তনুঅং বিসস্রে—
জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ ॥'

এবং উপনিষদে পাইতেছি—

'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বি
বৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥'

সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে মধুর রসের সাধনায় পরমাত্মা বা শাশ্বত সত্তা হইতেছেন পুরুষ, এবং মানব বা মানবাত্মা হইতেছে নারী। ইহার বিপরীত ভাব পাওয়া যায় না—উপরের অনুচ্ছেদে উদ্‌ধৃত বৈদিক সাহিত্যের কতকগুলি উদাহরণ ভিন্ন। এমন কি মুসলমান সূফী প্রভাবে প্রভাবান্বিত, ও স্পষ্ট করিয়া নিজেদের

'সূফী' আখ্যা যাঁহারা দিয়াছেন এমন মুসলমান ও হিন্দু কবিগণ, এই ভারতীয় কল্পনা-ই রক্ষা করিয়াছেন—ঈশ্বর পুরুষোত্তম, মানব যেন ঈশ্বরের প্রেমাকাঙ্ক্ষণী নারী। ঈরান ও আরবের সূফী মতে কিন্তু ইহার বিপরীতটি-ই দৃষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা হইতেছে। ভারতে সূফী-আধ্যাত্মিক ধারণা ও প্রকাশ-ধারা যাঁহারা পুরাপুরি মানিয়া লইয়াছেন, এবং প্রত্যক্ষ-ভাবে ফারসী সাহিত্যের আওতায় যাঁহারা পড়িয়াছেন, এমন কতকগুলি উর্দু-ভাষার কবি অবশ্য এই সনাতন বা ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন নাই—ঈশ্বর তাঁহাদের কাছে 'মা'শূকা' মা'শূক্', অর্থাৎ প্রেমের পাত্রী অথবা প্রেমের পাত্র, এবং মানব বা জীব হইতেছে 'আশিক্' অর্থাৎ প্রেমিক।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা'-বিষয়ক কবিতাগুলিতে কিন্তু ভারতীয় ধারার বিরোধী অন্য ভাবটিই পাইতেছি। এই 'জীবন-দেবতা' কে? এ বিষয়ে মতভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-চিন্তা বা ভাবধারার বিচার-বিশ্লেষণ যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ এই জীবন-দেবতা যে শাশ্বত সত্তা, পরমাত্মা বা 'ঈশ্বর' নহে, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদের গণ্ডির মধ্যে সীমিত (সগুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম, সাকার দেবতা, প্রভৃতি) ঈশ্বরীয় সত্তার বিভিন্ন বর্ণনা অথবা দার্শনিক প্রকৃতি নির্ণয়ের সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের অনুভূত ও 'জীবন-দেবতা' নামে অভিহিত এবং কবিতায় তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত সত্য-শিব-সুন্দর-স্বরূপ (এবং কবি-দৃষ্টির সামনে বিশেষ করিয়া সুন্দর-স্বরূপ) বিশ্ব-নিহিত ও বিশ্বাতিগ শাশ্বত সত্তার সম্পূর্ণ মিল না পাইয়া, এই 'জীবন-দেবতা'-কে ঐশ্বরিক সত্তা হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়া অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন; এবং সেই বস্তুটি যে কী, তাহার নির্ণয়ের জন্য শব্দের মালা গাঁথিয়াছেন। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা করিবার যোগ্যতা আমার নাই। তবে আমার মনে হয়, যে বিশ্বশক্তি বা বিশ্বদেবতা

ব্রহ্মাণ্ডময় লীলা করিতেছেন, মানব-জীবন সেই দেবতার অধিকারের বাহিরে নহে : 'খেলতি অণ্ডে, খেলতি পিণ্ডে'—সেই দেবতা বা সত্তা বা শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ক্রীড়া করিতেছেন, আবার মানুষের দেহপিণ্ডের অভ্যন্তরে তাঁহার-ই লীলা চলিতেছে ; Macrocosm ও Microcosm, বৃহৎ বা ভূমা, এবং অণু বা কণা, উভয়-ই তাঁহার লীলা-ক্ষেত্র, এবং সেই লীলার প্রকাশ বা ভঙ্গীও অনন্ত। রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি, বিশ্ব-মানবের অনুভূতির রাজ্যে একান্ত-ভাবে তাঁহার নিজের দান—তাঁহার কাব্যময় কৃতির মাধ্যমে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে এই বস্তুটি একটি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য মণ্ডিত হইয়া বিদ্যমান ; এবং চিরকাল ধরিয়া ইহা রসের অফুরন্ত উৎস হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালা ভাষা লোপ পাইলে বা ইহার আমূল পরিবর্তন ঘটিলে, এই বস্তুর প্রকাশ-সৌন্দর্য্য সাধারণ ভবিষ্যদ্-বংশীয়ের কাছে হয়তো ঢাকা পড়িয়া যাইবে ; কিন্তু অনুবাদের মাধ্যমে তাহার রস-বৈচিত্র্য বা রস-বৈশিষ্ট্য একেবারে লুপ্ত হইবে না।

অনুরাগ-রঞ্জিত এই দৃষ্টি বা অনুভূতি, বিশ্বের প্রেয়সী, এবং ব্যক্তিগতভাবে কবির প্রেয়সী এই যে সৌন্দর্য্যময় নারী-মূর্তিতে প্রকটিত শাশ্বত সত্য, কবির কাছে আসিল কী করিয়া ? এ সম্বন্ধে কার্য্য-কারণাত্মক বা ক্রম-বিচারমূলক অনুসন্ধান চলিতে পারে ; তাহাতে এই অপূর্ব রসসৃষ্টির সৌন্দর্য্য বা গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং ইহাকে সম্যক্ রূপে বুঝিবার পক্ষে সহায়তা-লাভ ঘটিতে পারে। **Beauty in the Abstract**, ভাবময় সৌন্দর্য্য, যাহা শাশ্বত সত্তারই রূপান্তর, তাহার সম্বন্ধে সূক্ত রচনা করিয়াছেন কবি তাঁহার 'উর্বশী' কবিতায়। এই নামের দ্বারায়, কবির অনুভূতি ও অনুভূতি-জাত রস-সৃষ্টির অন্যতম আধার বা প্রেরণাকে আমরা গোচরীভূত করিতে পারি। 'উর্বশী'র প্রথম প্রকাশ বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে—ঋগ্বেদের কবিতাময় পুরূরবা-

উর্বশী সূক্তে, শতপথ ব্রাহ্মণের গদ্য উপাখ্যানে। পরবর্তী কালে বিষ্ণুপুরাণেও উর্বশীর কথা পাই। প্রাচীন আর্য্য জগতের আখ্যানটির মৌলিক সরলতা ও মনোহারিতা বিষ্ণুপুরাণে কথিত গদ্যময় উপাখ্যান হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালে কালিদাসের নাটকে, তথা অন্য পুরাণে, এই উপাখ্যান বহুসঃ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া নিতান্ত অন্য ধরনের হইয়া গিয়াছে। সে যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা' পর্য্যায়ের কাব্য-সর্জনার মধ্যে, বৈদিক উর্বশীর কল্পনা একটি মূল-সূত্র রূপে বিদ্যমান।

'উর্বশী' কবিতার দ্বিতীয় অনুপ্রাণনা হইতেছে ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে—প্রাচীন গ্রীক প্রেম ও সৌন্দর্য্যের দেবী Aphrodite আফ্রোদীতে-র কল্পনা হইতে; প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য, ও তাহার আদর্শে গঠিত আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যে যে সৌন্দর্য্যানুভূতি আছে, তাহা-ও ইহার দ্বিতীয় অনুপ্রাণনা। তৃতীয় অনুপ্রাণনা আমার মনে হয় কবি পাইয়াছিলেন পরোক্ষ ভাবে—সূফী কবিতা হইতে। ঈশ্বরের বিভূতিস্বরূপ কবির নিজের দিব্য প্রতিভা, অবশ্য এই কবিতা-সর্জনার মূল উৎস। কিন্তু যে রঙ্গীন আলোক এই উৎস-ধারার উপর পড়িয়া তাহাকে এমন বিচিত্র বর্ণোজ্জ্বল করিয়াছে, অন্ততঃ তাহা অংশতঃ এই তিন বিভিন্ন দিক্ হইতে আসিয়াছে।

উর্বশীর কল্পনার ও উপাখ্যানের মূল কথা—দেবকন্যার সহিত মানবের প্রেম। এইরূপ উপাখ্যান বা কল্পনা নানা জাতির মধ্যে আছে; কিন্তু মনে হয়, কল্পনাশীল ইন্দো-ইউরোপীয় (আদি-আর্য্য) জাতির মধ্যে ইহার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। আদি-আর্য্য (বা ইন্দো-ইউরোপীয়) জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে এইরূপ এক বা একাধিক myth বা দেব-কাহিনী প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য, প্রাচীন ঈরানীয়, প্রাচীন গ্রীক, ইতালীয়, কেল্‌তিক, জর্‌মানিক ও স্লাব, ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির সকল

শাখার মধ্যেই এই ধরনের উপাখ্যান বা কথা পাওয়া যায়। অপ্সরা বা দিব্য-সৌন্দর্যমণ্ডিত সুন্দরীকে দেখিয়া মানুষ প্রেমে পড়িল। অমানুষী নিজেকে মানুষের কাছে ধরা দিল; পরে পার্থিব জীবনে বিগতরুচি হইয়া দেবকন্যা বা সুন্দরীর তিরোধান; এবং শেষে ইহ-লোকেই অথবা পর-লোকে মানুষ ও অমানুষী প্রেমিক-যুগলের মিলন ও মানুষের দেবত্ব-লাভ। এইরূপ উপাখ্যানে কতকগুলি খুঁটিনাটি আছে, সেগুলি আদি-আর্য্য-জাতির মধ্যে উদ্ভূত এই **myth** বা দেব-কাহিনীর মূল রূপে বিদ্যমান ছিল। যেমন 'আতি' বা **swan** অর্থাৎ রাজহংস রূপে অমানুষী অপ্সরোগণের বিচরণ। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে, অপ্সরা উর্বশী ও তাঁহার মানুষ প্রেমিক ও পতি রাজা পুরূরবার কথোপ-কথনাত্মক আঠারো ঋকের একটি সূক্ত আছে (ঋগ্বেদ, ১০।৯৫); শতপথব্রাহ্মণে সংক্ষেপে বর্ণিত গদ্য উপাখ্যান হইতে এই কথোপ-কথনের সূত্র ঠিক-মতো ধরা যায়।

অপ্সরা ও গন্ধর্ব বৈদিক দেব-জগতে **Romance of the Supernatural** অর্থাৎ অতিপ্রাকৃতের রমণীয়তার প্রতীক ও প্রকাশক। ঋগ্বেদের দেবতারা পুরাপুরি মানবধর্মী নহেন, তাঁহাদের প্রকৃতিতে নৈসর্গিক জগতের ছাপ বা ছোঁয়াচ বিদ্যমান—যদিও ইন্দ্র, ঊষা, সূর্য্য, অশ্বিদ্বয়, রুদ্র প্রভৃতি কতকগুলি দেবতার মধ্যে মানবধর্মিতা যথেষ্ট পরিমাণে আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু গন্ধর্ব ও তাহাদের সহিত সম্পৃক্ত অপ্সরাগণ—ইহাদের সম্বন্ধে যে কল্পনা, তাহা অন্য জিনিস। পৌরাণিক স্বর্গের মহামহিম সম্রাট্, অমাত্য ও চাটুকার-পরিবেষ্টিত রাজা ইন্দ্রের সভার নাচুনী রূপে অপ্সরাদের অবনমন তখন-ও হয় নাই। অপ্সরাগণ জল স্থল অরণ্য ও আকাশমার্গে বিচরণশীল স্বাধীন দেবযোনি, গন্ধর্বগণ অপ্সরাদের সহচর, পতি। স্বেচ্ছাবৃত্ত চিরযৌবনা অপ্সরাগণ, গ্রীক দেবলোকের **Naiad, Dryad, Nereid**-দের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের কেশি-সূক্তে

(১০।১৩৬) দেখিতেছি, দীর্ঘ-কেশ-ধারী মলিন-কাষায়-বস্ত্র-পরিধানকারী শৈব যোগী, যিনি রুদ্রের সঙ্গে এক পাত্রে বিষ পান করেন ('কেশী বিষস্য পাত্রেণ যদ্ রুদ্রেণাপিবৎ সহ'), তিনি নানা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন—সিদ্ধি লাভ করেন; তন্মধ্যে একটি কাম্য সিদ্ধি হইতেছে এই যে, তিনি অপ্সরা ও গন্ধর্ব এবং বন্য পশুর বিচরণ-ভূমিতে ইচ্ছামতো চলিয়া-ফিরিয়া বেড়ান ('অপ্সরসাং, গন্ধর্বাণাং, মৃগাণাং চরণে চরন্।')।

এই-রূপ এক অপ্সরা, উর্বশী ছিল যাঁহার নাম, তিনি ইলা-পুত্র রাজা পুরূরবাকে কামনা করিলেন, রাজা পুরূরবার পত্নীত্ব স্বীকার করিলেন। উর্বশীকে রাজা পত্নীরূপে পাইলেন, কিন্তু ইহার জন্য তাঁহার পক্ষে পালনীয় কতকগুলি তুচ্ছ প্রতিবন্ধ বা সময় বা শর্ত ছিল। উর্বশীকে আবার তাহাদের মধ্যে ফিরাইয়া পাইতে উৎসুক গন্ধর্বদের চেষ্টায় সেই প্রতিবন্ধ পুরূরবা অনিচ্ছায় ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, সঙ্গে-সঙ্গে উর্বশীও অন্তর্হিতা হইলেন। এদিকে রাজপত্নী উর্বশীর সন্তান-সম্ভাবনা। পুরূরবা প্রিয়াবিরহে তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শেষে কতক-গুলি অপ্সরা সহচরীর সহিত কুরুক্ষেত্রের হ্রদে আতি বা রাজহংসের রূপে তাঁহাকে জলক্রীড়া করিতে দেখিলেন। উর্বশী পুরূরবার সহিত আলাপ করিলেন। উভয়ে পূর্বের দাম্পত্য জীবনের কথার অনুস্মরণ করিলেন। এবং ভবিষ্যতে পুরূরবার সঙ্গে উর্বশীর আবার মিলন হইবে স্বর্গ-লোকে, বা গন্ধর্ব-লোকে এই কথার ইঙ্গিত করিয়া উর্বশী তিরোধান করিলেন।

এই তো উপাখ্যান। কিন্তু ঋগ্বেদের সূক্তসমূহে কতকগুলি বাক্য আছে, যেগুলিতে উর্বশীকে সামান্য একটি রূপকথার নায়িকার পদ হইতে মানুষের কামনার কেন্দ্রীভূত এক বিশ্বাবেশিনী নারী-রূপি সত্তা বা শক্তিতে পরিণত করিতেছে। এই সত্তাকে মানুষ পাইয়া-ও পাইতেছে না—অমানুষী এই শক্তিকে মানুষ সেবা করিয়াছে, লাভ করিয়াছে ('পুরূরবো অনু তে কেতমায়ং; রাজা মে, বীর!

তনুঅস্ তদাসীঃ' ; 'অমানুষীষু মানুষো নি সেবে') ; কিন্তু এই শক্তি বা সত্তা এখন প্রথম ঊষার ন্যায় চিরতরে অন্তর্হিত, বায়ুর ন্যায় দুরপনীয় ('প্রাক্রমিষম্ ঊষসাম্ অগ্রিয়েব··· দুরাপনা বাত ইবাহমস্মি')। কিন্তু তবুও আশা মনের কোণে জাগিয়া থাকে ;—উর্বশী একবার দেখা দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, পুরূরবার আকুল কামনা—

> অন্তরীক্ষপ্রাং রজসো বিমানীম্
> উপ শিক্ষামি উর্বশীং বসিষ্ঠঃ।
> উপ ত্বা রাতিঃ সুকৃতস্য তিষ্ঠাৎ ;
> নি বর্তস্ব—হৃদয়ং তপ্যতে মে ॥—

"অত্যন্ত কামনাযুক্ত হইয়া আমি উর্বশীকে আহ্বান করি—যে উর্বশী অন্তরীক্ষকে পূর্ণ করিয়া রাখে, ও আকাশ-মার্গকে পরিমাণ করে। আমার সমস্ত সুকৃতের বা পুণ্যকর্মের ফল তোমাতেই পহুঁছাক্ ; ফিরিয়া আইস, আমার হৃদয়, তপ্ত হইতেছে।"

এই পুরূরবা-উর্বশীর ঋক্‌গুলির মধ্যে, বিশেষ করিয়া উপরে উদ্‌ধৃত ঋক্‌টিতে, রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর মহীয়সী কল্পনার কতকগুলি বীজ যেন বিদ্যমান। উর্বশী নামটির মৌলিক অর্থ সম্ভবতঃ ইহা-ই ছিল—'উরু' অর্থাৎ প্রচুর বা পূর্ণ' 'বশ' অর্থাৎ কামনা যাহার বা যাহার জন্য (উরু + √বশ্ + -ঈ)। প্রাচীন গ্রীক-ভাষায় ইহার প্রতিরূপ হইবে *Euru-wekia—*Eurekia। এই হিসাবে, '*উরু-বশী—উর্-বশী, উর্বশী' শব্দের অর্থ হইতে পারে **the World's Desire**,—রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'বিশ্ববাসনা'।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের উর্বশী-পুরূরবা-সংবাদময় পঁচানব্বই-য়ের সূক্তের উদ্‌ধৃত এই সতেরোর উপান্ত ঋক্‌টিতে, অমানুষীর সহিত মানুষের প্রেমের কাহিনী বা রূপকথাটি সাধারণ পার্থিব সত্তা বা জীবনের ঊর্ধ্বে একেবারে অতীন্দ্রিয় লোকে উন্নীত হইতেছে। এখানে, এমন কি মানুষের নৈতিক জীবনের সার্থকতা

হইতেছে জীবনের পিছনে অবস্থিত শাশ্বত সত্তাতে তাহার সমস্ত কর্মচেষ্টা, সমস্ত শুভ কার্য্য, সব সুকৃতের সমর্পণের মধ্যে-ই—এরূপ ইঙ্গিতও রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার পরিকল্পনার মধ্যে, গ্রীক দেবী **Aphrodite** আফ্রোদীতে ও আফ্রোদীতেকে আশ্রয় করিয়া পরবর্তী ইউরোপীয় সাহিত্যে (বিশেষ করিয়া গ্যেটে হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে) বিশ্ব-মধ্যে লীলায়িত সর্বসুন্দরী দৈবশক্তির যে আবাহন ও অনুধ্যান চলিয়াছে, তাহার-ও প্রভাব আছে। আফ্রোদীতে প্রেমের ও কামের দেবী; তিনি মানব-সম্পর্কের ঊর্ধ্বে অবস্থিত অনৈতিক আকর্ষণ-শক্তি; জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের বিগ্রহ-স্বরূপা তিনি। 'আফ্রোদীতে' নামটির সংস্কৃত প্রতিরূপ '*অভ্রদত্তা' হইতে পারে—'অভ্র বা মেঘের দান', এই অর্থে; এবং মূলে হয়তো ইনি অপ্-সরার মতো জল-মধ্যে বিচরণশীলা দেবী ছিলেন। **Sophokles** সোফোক্লেস, **Euripides** এউরিপিদেস্ প্রমুখ প্রাচীন গ্রীসের প্রধান কবিগণ, দেবী আফ্রোদীতে, এই নামের মধ্যে অবস্থিত **Cosmic** অর্থাৎ বিশ্বম্ভর ও বিশ্বন্ধর ভাব বা কল্পনার পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গ্রীক কবিদের দুই-একটি উক্তি ইংরেজি ও বাঙ্গলা অনুবাদে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যায়—

My children, of a surety Cypris is
Not Cypris only, but bears many a name;
Death is her name, and Might imperishable,
And maniac Frenzy, and unallayed Desire,
And Lamentation loud. All is in her;
Impulse, and Quietude, and Energy;
For in the bosoms of all souls that breathe

This Goddess is instilled. Who is not prey
For her ? She penetrates the watery tribe
Of fishes ; She is in the four-legged breed
Of the dry land ; in birds her wings bears sway
In brutes, in mortals, in the Gods on high···
····without spear,
Without a sword, Cypris cuts shorts all counsels
Both human and divine.

(সোফোক্লেস হইতে, Sir George Young-এর অনুবাদ ; Cypris=Kupris, Aphrodite আফ্রোদীতের অন্য নাম।)

'বৎসগণ, নিশ্চয়-ই কুপ্রিস্-দেবী (আফ্রোদীতে) কেবল কুপ্রিস্-ই নহেন, কিন্তু তিনি বহুনাম-যুক্তা ! তাঁহার নাম 'মৃত্যু', এবং অবিনশ্বর 'শক্তি', এবং 'উন্মাদনা', এবং অতৃপ্ত 'কামনা', এবং নিনাদিনী 'ক্রন্দসী' ; সব-কিছু তাঁহাতেই বিদ্যমান ; 'আকাঙ্ক্ষা' এবং 'শান্তি', এবং 'কর্মদ্যোতনা'। শ্বাস-যুক্ত প্রত্যেক জীবের বক্ষো-মধ্যে দেবী আসীনা আছেন। এমন কে আছে যে তাঁহার শিকার নহে ? জলচর মৎস্যকুলের মধ্যে তিনি চরণশীলা ; শুষ্ক পৃথিবীর উপরে চতুষ্পদ কুলের মধ্যেও তিনি বিরাজমানা ; পক্ষি-কুলের মধ্যে তাঁহার-ই পক্ষ কার্যকর। পশু মানব, স্বর্গবাসী দেবতা, সকলেই তিনি। বর্শা বা তরবারীর সাহায্য না লইয়া, কুপ্রিস্-দেবী মানব ও দৈব সর্বপ্রকার বিচার করিয়া দেন।'

She ranges with the stars of eve of morn,
She wanders in the heaving of the sea,
And all life lives from her.—Aye, this is she
That sows Love's seed and brings
Love's fruit to birth ;
And great Love's brethren are all we on earth !

(এউরিপিদেস্ হইতে, Dr. Gilbert Murray-র অনুবাদ।)

"সন্ধ্যা ও ঊষার তারকার মধ্যে দেবী বিচরণ করেন, সাগরের হিল্লোলে তিনি দোলায়িতা হন; সমস্ত জীবন তাঁহা-হইতে প্রাণ পায়। হাঁ, ইনি-ই তিনি, তিনি প্রেমের বীজ বপন করেন ও প্রেমের ফল উৎপাদন করেন। মহৎ প্রেমের-ই ভ্রাতৃরূপী আমরা সকলে—এই ভূমির উপরে।"

নারী-সম্বন্ধে মানুষের প্রেম ও কাম বিষয়ক সাধনা ও আগ্রহের নিয়ন্ত্রী রূপে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে আফ্রোদীতের এইরূপ বহু উল্লেখ আছে। গ্রীক স্ত্রী-কবি **Psappha** প্সাপ্‌ফা বা **Sappho** সাপ্‌ফো-র কতকগুলি গীতি-কবিতার ভগ্নাংশের কথা বিশেষ করিয়া স্মরণ করা যায়।

নূতন করিয়া এ যুগে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য ও ভাব-ধারার পুনরাবিষ্কারের পরে ও ইহার পুনরালোচনার ফলে, এই বিশ্ব-নিয়ন্ত্রী সৌন্দর্য্যময়ীর কলপনা আধুনিক ইউরোপকে আবার নূতন দৃষ্টি, নূতন প্রেরণা দিয়াছে।

গ্যেটের জীবনব্যাপী জ্ঞান ও সাহিত্য-কলার সাধনার ফল **Faust** 'ফাউস্ট্' নামক মহাকাব্য-রূপী নাটকের শেষ কথা—

Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan—

—শাশ্বত নারী-রূপিনী আমাদিগকে ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিতেছে।

ইংরেজ কবি **A. C. Swinburne** সুইন্‌ব্যর্‌ন্ গ্রীক ভাবের (বিশেষ করিয়া ইউরোপে খ্রীষ্টান-ধর্ম প্রসার লাভ করিবার পূর্বে যে প্রাচীন গ্রীক ধর্ম গ্রীসদেশে প্রচলিত ছিল তাহার চিন্তাধারার) পুনরানয়নের চেষ্টায়, আধুনিক ইংরেজি-সাহিত্যে গ্রীক দিব্যদৃষ্টি আনিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষায়, যে-সব কবিতা ও যে দু'খানি অপূর্ব নাটক রচনা করেন, সেগুলির মধ্যেও এই বিশ্ব-নিয়ন্ত্রী রমণীয়তারও প্রশস্তি উদার ছন্দে ও উদাত্ত ভাষায় গাহিয়া গিয়াছেন। তাঁহার **Hertha** কবিতা, **The Last Oracle**

প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা ; এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার গ্রীক্ রীতিতে রচিত নাটক **Atalanta in Calydon**-এ, আফ্রোদীতে-বন্দনাময় **Chorus** অর্থাৎ সমবেত-পাঠ—আধুনিক ইউরোপীয় ও বিশ্ব-সাহিত্যের কতকগুলি অপূর্ব বস্তু ; সুইন্‌ব্যর্‌নের এই অনবদ্য সৃষ্টির সাক্ষাৎ প্রভাব রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী'তে আসিয়াছে বলিয়া কেহ-কেহ মনে করেন ; এইরূপ মনে করা অযৌক্তিকও নহে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যময় প্রকাশে এবং বিশেষ করিয়া 'জীবন-দেবতা'র কল্পনায় ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণা বা প্রভাব কতটা ছিল, তাহার বিচার হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথের মতো বিরাট্ প্রতিভা ও মনীষা ছিল সর্বগ্রাহী ; সব-কিছু হইতেই তিনি ভাব ও প্রকাশ আত্মসাৎ করিবার শক্তি রাখিতেন। কিন্তু এখানেই তাঁহার মহত্ত্ব যে, তিনি যাহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার উপর তাঁহার স্বকীয় প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের জ্যোতি পড়িয়া, তাহাকে একেবারে তাঁহার নিজের জিনিস করিয়া দিয়াছে : **In literature, a thing becomes his who says it best.**

রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা'র কল্পনায় ও অনুভূতিতে আর একটি দিক হইতে কতকটা প্রভাব আসিয়া গিয়াছিল মনে করি—ইহা হইতেছে—সূফী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাত্মাকে মানবের বা মানবাত্মার প্রেমাস্পদ রূপে কল্পনা। সূফী সম্প্রদায়ের উদ্ভব, ইতিহাস ও সিদ্ধান্তের কথার সম্যক্ আলোচনার স্থান ইহা নহে। তবে সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রাথমিক ইস্‌লামের মধ্যে মানুষ ও ঈশ্বরের সম্পর্ক এইভাবে কল্পিত হয়,—ঈশ্বর প্রভু, মানুষ তাঁহার দাস। ইহা-ই হইতেছে ইস্‌লামের বাহ্য রূপ। আভ্যন্তর অনুভূতিতে লোকোত্তর চরিত্রের মানুষ ঈশ্বরের সহিত সখিত্ব বা মিত্রতার কোঠাতেও পহুঁছিতে পারে, ইহা-ও প্রাথমিক ইস্‌লামের সিদ্ধান্ত ছিল। প্রথম যুগের ইস্‌লামী (আরব)

সাধকেরা একান্তে এই দাস্য-ভাবের সাধনা করিতেন—তাঁহাদের এই বিবিক্ত সাধনার মধ্যে সূফী মতবাদের বীজ নিহিত ছিল। আদ্য ইস্‌লামের 'মীরাবাঈ', আরব সিদ্ধা রাবিয়া (তিরোধানের সময়, খ্রীষ্টাব্দ ৮০১) দাস্য-ভাবের পরিবর্তে ঈশ্বর-প্রেম আনিয়া সূফী মতবাদের ও উপলব্ধির মোড় ফিরাইয়া দিলেন—এই প্রেম ঠিক বৈষ্ণব মধুর রস বা অনুরাগ নহে, কিন্তু তাহার আভাস-স্বরূপ। রাবিয়া-র একটি প্রার্থনার অনুবাদ—

O my Lord, the stars are shining, and the eyes of men are closed, and kings have shut there doors, and every lover is alone with his beloved, and here am I alone with Thee.

"প্রভু আমার, উপরে তারকাসমূহ জ্বল্‌-জ্বল্‌ করিতেছে; মানবচক্ষু নিমীলিত ; রাজারাও প্রাসাদদ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন ; প্রত্যেক প্রেমিক তাহার প্রেমিকার সঙ্গে একান্তে অবস্থান করিতেছে ; আর আমিও এখানে একা, কেবল তোমার সঙ্গে।"

উত্তরকালে এই ধর্ম-সাধনার ধারায় আসিয়া মিলিত হইল গ্রীক নব্য-প্লাতোনীয় দর্শনের gnōsis বা মারিফাৎ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান, এবং ভারতীয় অদ্বৈত বেদান্তের 'শিবোঽহম্‌' বা 'অহম্‌ ব্রহ্ম অস্মি'। কিন্তু রাগাত্মক সাধনা ও অনুভূতিও চলিল। পরবর্তী যুগের ঋষি মন্‌সূর অল্‌-হল্লাজ (মৃত্যুকাল ৯২২ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে আরম্ভ করিয়া ধারাবাহিক রূপে সূফী সাধক-দের পাইতেছি, যাঁহাদের চেতনায় ও কাব্যময় প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা'র-ই (আংশিক ভাবে অন্ততঃ) পূর্বাভাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া নাম করা যায় এই কয়জনের—হকীম আবুল মজ্‌দ্‌ মজ্‌দূদ্‌ সনাঈ—পারসীক (একাদশ শতক); ফরীদুদ্দীন 'অত্তার—পারসীক (খ্রীষ্টাব্দ ১১২০—১২৩০); 'ওমর ইব্‌নুল-ফরীদ—মিসরীয় আরব (১১৮১—১২৩৫); মুহ্‌য়িউ-দ্‌-দীন ইব্‌নুল্‌-'অরবী—

হিস্পান-দেশীয় আরব (১১৬৫—১২৪০); এবং জলালুদ্দীন রূমী—পারসীক (১২০৭—১২৭৩; শেখ সাদী—পারসীক (১১৮৪—১২৯১); সাদুদ্দীন মহ্মুদ শবিস্তরী—পারসিক (১২৫০—১৩২০?); মুহম্মদ শম্সুদ্দীন হাফেজ—পারসীক (মৃত্যু ১৩৯০); ও নূরুদ্দীন 'আব্দুর্-রহ্মান জামী (১৪১৪—১৪৯২)। ইঁহাদের সকলের অনুভূতির কাব্যময় প্রকাশে, ইঁহাদের 'জীবন-দেবতা' হইতেছেন প্রেমাস্পদ—প্রেমের পাত্রী বা পাত্র, প্রেমিক পুরুষ নহেন;—এই প্রেমাস্পদ বা প্রেমের পাত্র, ক্বচিৎ সুন্দরী তরুণী নারী-রূপিণী, ক্বচিৎ (পশ্চিম এশিয়াখণ্ডের অধিবাসীদের সামাজিক জীবনের রীতি অনুসারে) সুন্দর কিশোররূপী নারীরূপে কল্পিত 'জীবন-দেবতা' বা শাশ্বত সত্তাকে আরবী ভাষায় 'মা'শূক্বা' ma-'shūqah (মা'শূক্বৎহুন্ ma'shūqathun) আখ্যা দেওয়া হয়, ও কিশোর-রূপী হইলে 'মা'শূক্' ma'shūq' (মা'শূক্বুন্ ma'shūqun); এবং প্রেমিক জীবাত্মা বা মানব হইতেছে ''আশিক্' 'āshiq (''আশিক্বুন্ 'āshiqun)। এই শব্দগুলি আরবী ''শ্ক্' 'shq ধাতু হইতে গঠিত; এই ধাতুর অর্থ 'প্রেম করা, ভালোবাসা'।

সূফীদের প্রত্যক্ষ প্রভাব ভারতবর্ষের মধ্য-যুগে খ্রীষ্টীয় পনেরো শতক হইতে আসিতে আরম্ভ করে। কবীর প্রভৃতি সন্তগণের অনুভূতিতে ও শিক্ষায়, ও নানা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপরে—আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ধরিয়াও—এই প্রভাব পড়িয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু ভারতের অনুভূতিতে শাশ্বত-সত্তা বা পরমাত্মা বা ঈশ্বরের প্রতি আরোপিত পুরুষোত্তমের কল্পনার পরিবর্তে, শাশ্বতী অনুরাগ-পাত্রী নারী-সত্তমা বা নারী-শ্রেষ্ঠার কল্পনা গৃহীত হয় নাই;—পরবর্তী কালের ফারসী কবিতার অন্ধ অনুকারক উর্দূ কবিগণ ভিন্ন, ভারতীয় সূফীগণ, কি হিন্দু কি মুসলমান, পুরুষোত্তমেরই আবাহন করিয়াছেন।

নিম্নে সূফী কবিদের দুই-চারিটি কবিতাংশ বাঙ্গলা অনুবাদে দেওয়া যাইতেছে—

'ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া এই জগতের হাটে, আসিয়াছ তুমি কে ?
তোমার টানেই সমগ্র মানব-জাতি তোমার সঙ্গে চলিয়াছে !
তোমার সুন্দর তনুর একটি রশ্মি
আমাদের বিশ্ব-মানবকে উদ্ভাসিত করিয়াছে ;
তোমার বোনা ফসল প্রত্যেক গাছকে ফলবান্ করিয়াছে।'

—ফরীদুদ্দীন্ আত্তার।

'তাহার কেশগুচ্ছের রাত্রির মধ্যে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছে ;
কালো নর্‌গিস্ ফুল লাল গোলাপকে শিশির-সিক্ত করিয়াছে।'

—ইব্‌নু-ল্ আরবী।

'সে (মা'শূকা) যদি মনের মধ্যে ঠাঁই পায়, কল্পনা-ও তাহাকে পীড়িত করে ; তাহাকে কি চোখে দেখা যায় ?'

—ইব্‌নু-ল্-আরবী।

'সে প্রীতির দিব্যমূর্তি, তার কথা ভাবিলেই সে মূর্তি গলিয়া যায়—দৃষ্টিপথের পক্ষে সে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম।'

—ইব্‌নু-ল্-আরবী।

'জ্যোতির আকাশ তাহার পায়ের তলায় ;
দ্যুলোক স্বর্লোকের ঊর্ধ্বে তাহার মুকুট।'

—ইব্‌নু-ল্-আরবী।

'আমার রজনী তাহার মুখের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত,
আমার দিন তাহার কেশ-জালের আঁধারে ভরা।'

—ইব্‌নুল্‌-আরবী।

'প্রাণের মধ্যে কোন্ এক নব-বধূর আগমন হইয়াছে।
তাহার মুখের প্রতিচ্ছবিতে, সমগ্র জগৎ,
নব-বিবাহিত বর-বধূর হস্তের মতো হিল্লোলময় ও রাগ-রঞ্জিত হউক।'

—জলালুদ্দীন রূমী।

'আমি তোমার বীণা, আমার প্রত্যেক তারে তুমি আঘাত করিতেছ,
আমি তাহাতে রণ্‌রণিয়া উঠিতেছি!'

—জলালুদ্দীন রূমী।

সূফী কবিদের রচনা হইতে এইরূপ বহু-বহু ছত্র উদ্ধার করিয়া দেওয়া যায়, যেগুলি শ্রবণমাত্রেই রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা' কবিতার কথা মনে পড়িয়া যায়। প্রত্যক্ষ-ভাবে এই-সব লেখার সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের সংবাদ আমরা জানি না। তবে তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, সূফী কবি হাফেজের ভক্ত ছিলেন, হাফেজের পদ ও পদাংশ তিনি আবৃত্তি করিতে ভালোবাসিতেন। হাফেজ প্রভৃতি সূফী কবির এই মাশূক্বা-কল্পনার সহিত তাঁহার পিতার প্রসাদে রবীন্দ্রনাথ কিছু পরিমাণে হয়তো প্রথম পরিচিত হইয়া থাকিবেন। এই-ভাবে তাঁহার নিজের অনুভূতির অভিব্যক্তিতে সূফী ভাব-জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান, এই **World's Sweetheart**-এর অনুধ্যান, কিছুটা কার্য্যকর হইয়া থাকিবে। যেমন পরোক্ষ-ভাবে আমাদের বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে জলালুদ্দীন রূমী প্রমুখ পারস্যের সূফী সাধকদের ভাব-ধারা

কিছুটা অন্ততঃ আসিয়া গিয়াছিল, এরূপ অনুমানের পক্ষে সংগত বা যুক্তিযুক্ত কারণ আছে বলিয়া মনে করি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিক ধারা এবং কাব্যময় প্রকাশ, উভয় ব্যাপারের কর্ণধার-স্বরূপ শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন দুইজনেই যে ফারসী ভাষাতেও পণ্ডিত ছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। তাঁহারা গৌড়ের স্বাধীন সুলতানের দরবারে কাজ করিতেন—একজন ছিলেন সুলতানের 'দবীর-খাস' বা খাস-মুন্‌শী, অর্থাৎ **Private Secretary** বা অন্তরঙ্গ সহকারী, আর অন্যজন ছিলেন 'সাগির মলিক' অর্থাৎ ছোটো রাজা বা প্রতিরাজ, অর্থাৎ রাজপ্রতিভূ-পদাধিষ্ঠিত উচ্চ অমাত্য। রাজভাষা ফারসী এবং তৎসঙ্গে ফারসী সাহিত্য ইঁহাদের ভালো করিয়াই জানা ছিল।

এক-একটি পূর্ণ বস্তুকে বিশ্লেষ করিলে, তন্মধ্যে নানা উপাদান পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যময় প্রকাশ সম্বন্ধেও সেই কথা। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে, নানা স্থান হইতে লব্ধ বিভিন্ন উপাদানকে লইয়া, রবীন্দ্রনাথ যে পরিপূর্ণ নব-কলেবর দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা একটি অভিনব ও বিস্ময়কর সর্বজন-মনোহর রস-সৃষ্টি ; এবং বিশ্বমানব সহৃদয়তার সহিত চিরকাল ধরিয়া এই রস আস্বাদন করিয়া ধন্য হইবে—অতীন্দ্রিয় শাশ্বত সত্তাকে আমাদের জীবনে ধরিবার মনোগত আকূতিকে জাগরিত ও উন্নীত করিবার পথে, এই রস-সৃষ্টি আমাদের চিরকাল ধরিয়া শক্তি ও আনন্দ দান করিবে ॥

এই প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয় বাঙ্গালা ১৩৫৬ সালের 'শারদীয়া বসুমতী'তে। পরে, সংশোধিত ও কিঞ্চিৎ পরিবর্ধিত রূপে, ১৩৮৬ সালে প্রকাশিত লেখকের প্রবন্ধ-সংকলন 'সাংস্কৃতিকী' প্রথম খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়।

ভূমিকা

कबीर

ত্রিপুরার আঞ্চলিক রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী-সমিতির পক্ষ হইতে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বসু প্রমুখ কতকগুলি উৎসাহী সাহিত্যিক ও অন্যকর্মীর চেষ্টা ও যত্নে প্রস্তুত এই বইখানিকে বাংলা সাহিত্যের ও বঙ্গদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অপূর্ব গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই যুগের এক বিরাট যুগন্ধর মহাপুরুষ ছিলেন, এবং নানা দিক দিয়া বিচার করিয়া বলিতে হয় যে তাঁহার জীবনে প্রায় আশি বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষের সংস্কৃতি যেন মূর্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এই বিরাট্ ব্যক্তিত্বের সমগ্র রূপটী জানা তো সম্ভবপর নহে—কর্মবিপুল রবীন্দ্রজীবনের বহু ঘটনা বহু তথ্য আমাদের কাছে এখনও ধরা দেয় নাই। সূর্যের মতই তিনি যেখানেই প্রকাশিত হইয়াছিলেন সেখানেই তাঁহার জ্যোতির্ময় স্বরূপের কিছু না কিছু রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার পূর্ণ সংগ্রহ ও সংগ্রথন দুঃসাধ্য, হয় তো বা অসাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ অন্য নানা দেশ ও স্হানের মত ত্রিপুরাতেও আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-রচনাবলীর মধ্যে ত্রিপুরার সহিত তাঁহার এই সংযোগ এবং এ বিষয়ে ত্রিপুরার দান একটি লক্ষণীয় ও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠক ও আলোচক সে সম্বন্ধে সচেতন আছেন। কিন্তু ত্রিপুরার সঙ্গে, বিশেষ করিয়া ত্রিপুরার রাজবংশের কতকগুলি অভিজাত ব্যক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে নিবিড় আত্মীয়তা ঘটিয়াছিল, যেভাবে তাঁহারা সুদূরপ্রসারী দিব্যদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক ও অন্যবিধ মহত্ত্ব দেখিতে পাইয়াছিলেন, সে সমস্ত কথা এতদিন বিলুপ্তির গর্ভে যাইতে বসিয়াছিল। ত্রিপুরার রাজবংশের অশীতিবর্ষদেশীয় শ্রদ্ধেয় মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা (লালকর্তা) প্রমুখ রবীন্দ্রগোষ্ঠীর কতকগুলি অন্তরঙ্গ গুণজ্ঞের সহায়তায়, ত্রিপুরার রাজবংশের সহিত রবীন্দ্রনাথের যে পত্র ব্যবহার ছিল তাহা উদ্ধার করিয়া, রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরার

সংযোগের এই আশ্চর্য ইতিহাস সংকলিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের নানামুখী প্রতিভার ও ব্যক্তিত্বের একটি লক্ষণীয় দিক আমাদের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, এবং তাহার ফলে রবীন্দ্রনাথের জীবনের, তাঁহার মনন ও কর্ম চেষ্টার একটি অজ্ঞাতপূর্ব রূপ আমরা দেখিতে পাইতেছি, বঙ্গদেশ ও ত্রিপুরার আত্মিক যোগেরও পরিচয় পাইতেছি।

এই পুস্তকগুলি, রবীন্দ্র-জন্ম-শত-বার্ষিকীর পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী হইয়াছে। মূলপত্রাদির পাঠ ও প্রতিলিপি ইহাতে প্রমাণপঞ্জীরূপে উদ্ধৃত হওয়ায়, এবং কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য চিত্র এই পুস্তকে প্রথম প্রকাশিত হওয়ায় ইহার ঐতিহাসিক মূল্যও অসাধারণ হইয়াছে।

এইবার ত্রিপুরায় আসিয়া এই পুস্তকের সংকলন ও প্রকাশনের আয়োজন দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আমি এই জন্য ত্রিপুরা রবীন্দ্র-জন্ম-শত-বার্ষিকী সমিতির সদস্যগণ ও তাঁহাদের সহায়কগণের নিকট আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি, এবং বাঙ্গালা সাহিত্য ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই পুস্তকের স্বাগত করিতেছি। ইতি—আগরতলা ৫ই বৈশাখ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। ১৮ই এপ্রিল ১৯৬১।

আগরতলা, ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' স্মারক গ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে রচিত।

পূর্ণ গ্রন্থতালিকা

আলেখ্য

প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর
অবনীন্দ্র-চরিতম্ ২৫.০০

বাণভট্ট/প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর
হর্ষচরিত ৪০.০০

দণ্ডী/প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর
দশকুমার চরিত ৩০.০০

কালীপদ সরকার
ইতিহাস-পুরুষ নেতাজী ৩০.০০

ওঁকার শরদ/অলকা মুখোপাধ্যায়
লোহিয়া ঃ রামমনোহর ১০০.০০

স্মৃতিকথা

পাব্‌লো নেরুদা/ডাক্তার ভবানীপ্রসাদ দত্ত
অনুস্মৃতি ৪০.০০

চারুকলা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী ৪০.০০

ভাষাতত্ত্ব

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ ৬০.০০
বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা ৫০.০০
ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা ৪৫.০০

সাহিত্যালোচনা

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ
রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও সাহিত্য ১০.০০

উদ্ধৃতিমালা

দাউদয়াল মেহ্‌রা সঙ্কলিত
অনুবাদ : সরিৎশেখর মজুমদার
সম্পাদনা : চিত্তরঞ্জন মাইতি
কুড়োনো মানিক ৪০.০০

পরিতোষ ঠাকুর
শুক্তিমুক্তাবলী ৩০.০০

श्री